মরন ছুঁয়ে

মৃগাঙ্ক কৃষ্ণ রায়

বেলুড় মঠের ভেতরে ঢোকার আগে, সতীশ সচেতনতার সঙ্গে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপর ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখে। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই সে পৌঁছে গেছে। সতীশ গঙ্গার পারে এসে দাঁড়ায়। তার মতো অনেকেই এসেছে তবে তার উদ্দেশ্য বেলুড় মঠ দর্শন নয়। উদ্দেশ্য অন্য হলেও স্বামীজির গৃহ, রামকৃষ্ণ মন্দির ইত্যাদি দর্শন না করে ঘরে ফেরার কথা

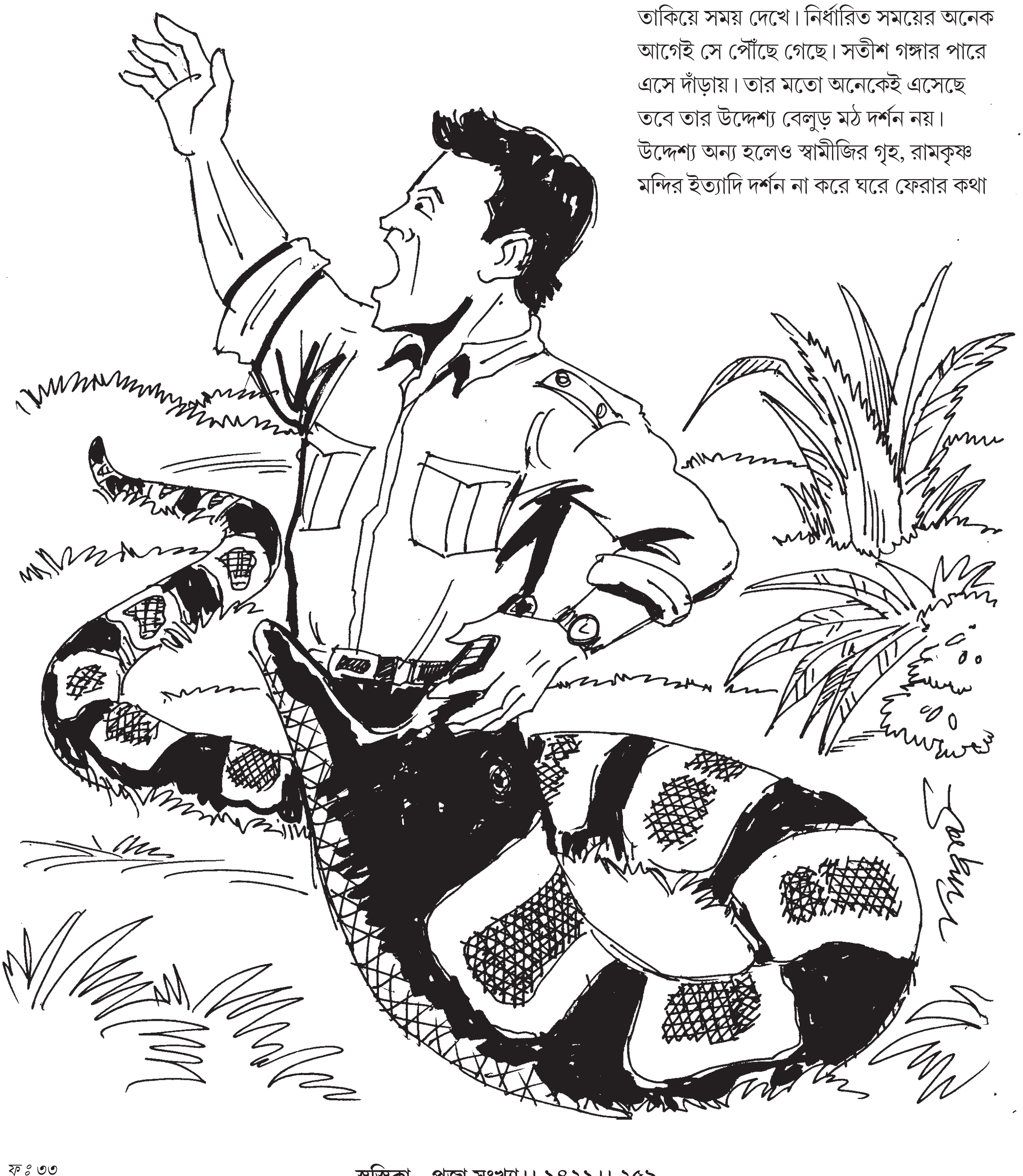

সে ভাবতেই পারে না। সতীশ স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তাকায় গঙ্গার দিকে। অনেক পুণ্যার্থী নৌকায় করে বেলুড় মঠে আসছে। কী সুন্দর জায়গা! এপারে মঠ ওপারে দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মন্দির। মঠের প্রাঙ্গণভূমিতে দাঁড়ালেই দেহ-মন কেমন পবিত্র হয়ে ওঠে। সতীশ অনুভব করে যে, তার হৃদয়ের ভেতরে যেভাব জাগরিত হচ্ছে তাকে ধরে রাখার সক্ষমতা তার নেই। দেহ-মন যখন সাময়িকভাবে পাপ-কাম মুক্ত হয়, তখনই এই ভাব-এর বিকাশ ঘটে, কেউ কেউ অনুভব করে স্বর্গের স্বাদ; কেউ কেউ অনুভব করতে পারে না বটে তবে কয়েক মুহূর্ত অনাবিল আনন্দ পায়। সতীশ এখানে না এলে এই অনির্বচনীয় ঐশ্বর্য-ভাব কোনোদিনই হয়তো অনুভব করতে পারতো না। এমন ঐশ্বর্য হৃদয়ের ভেতর লুকানো থাকতে পারে—ভাবাই যায় না, সেইজন্যই মনীষীরা বলে থাকেন মানুষের হৃদয়-ভাণ্ডারে যে ঐশ্বর্য আছে তা অফুরন্ত এবং বৈচিত্র্যময়। সতীশ দূর্বাঘাসের ওপর বসে। সে মনে মনে অনুভাকে ধন্যবাদ দেয়। অনুভাই তাকে এইখানে আসতে বলেছে। অনুভার রুচিবোধের প্রশংসা করে সতীশ। সে আবার সময় দেখে। অনুভার আসা উচিত। বেশিক্ষণ এখানে বসা যাবে না। অনুভা অবশ্য বলেছে বেশি সময় তাকে আটকিয়ে রাখবে না। অনুভা বিশেষ কয়েকটি কথা তাকে বলবে। সতীশ মনে মনে বিস্মিত হয়েছে কিন্তু 'বিস্ময়-ভাব' বাইরে প্রকাশ করেনি। বিস্মিত হবার কারণ, সে অনুভাকে অনেকদিন দেখলেও বা একই অফিসে কাজ করলেও কোনোদিন তার সঙ্গে কথা বলেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা সে তার দিকে ভালো করে কোনোদিন তাকায়নি। অথচ সেই অনুভার অনুরোধেই সতীশ গঙ্গার ধারে তার পথ চেয়ে বসে আছে। সতীশ আবার সময় দেখে। এতক্ষণে অনুভার আসা উচিত ছিল। সতীশ উঠে দাঁড়ায়। গঙ্গাকে পিছনে রেখে সামনের দিকে তাকায়। না, অনুভাকে দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গার পাড় থেকে সরে স্বামীজির বাসগৃহের দিকে এগিয়ে যায় সতীশ। অনুভাকে সঙ্গে নিয়ে যোগীদের মন্দির দর্শন করার ঐকান্তিকতা তার ছিল কিন্তু তার অপেক্ষায় থাকলে মন্দির দেখা হয়তো হোত না। বরঞ্চ, মন্দিরগুলি দর্শন করে গঙ্গার পারে বসবে তার অপেক্ষায়। ভাবতে ভাবতেই সতীশ দোতলার ওপরে উঠে, জানালা পথে, স্বামীজির স্মৃতিবিজড়িত শয্যাদ্রব্য, ধ্যানাসন, সংগীত সাধনার তানপুরা ইত্যাদি দেখে, অদ্ভুত একটি ভাবকে বুকে ধারণ করে নিচে নেমে এল। আবার হাঁটতে লাগল। সারদাদেবী, ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামীজির মন্দির দর্শন করে সতীশ পূর্বস্থানে ফিরে এল। সতীশ থমকে দাঁড়াল। লজ্জায় তার চোখমুখ আরক্তিম হয়ে ওঠে। কারণ, কয়েকমুহূর্ত অপেক্ষা করলে অনুভার সঙ্গেই পুণ্যার্জন করতে পারত। সে ধীর পদবিক্ষেপে অনুভার পিছনে দাঁড়িয়ে তার পৃষ্ঠদেশের রমণীয় সৌন্দর্যের আকর্ষণে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তার মনে হতে লাগল এতো সুন্দর পৃষ্ঠদেশ অন্যকোনো রমণীর হতে পারে না—অবশ্য দীর্ঘদিন এমন করে কোনো মেয়ের সৌন্দর্যের অনুসন্ধান সে করেনি। সতীশ কীভাবে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারে না। সে ধীরে ধীরে অনুভার পাশে এসে দাঁড়ায়।

অনুভা সতীশের দিকে তাকিয়ে বলল—সতীশ, রাগ কোরো না, প্রথম দিনই আমি সময়ের মূল্য রক্ষা করতে পারিনি। এজন্য আমি লজ্জিত।

সতীশ স্মিত হেসে ওর পাশে বসতে বসতে বললে, আমি রাগ করিনি। তুমি কি করে জানতে পারলে, আমি তোমার থেকে আগে এখানে পৌঁছিয়েছি?

ঃ দূরের থেকে তোমাকে দেখেছি। তুমি সারদা মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলে। সতীশ কোনো উত্তর দেয় না। তাকায় অনুভার দিকে। দীর্ঘদিন পর, আজ এই শান্ত, গঙ্গার তীরে, দিনান্তের শেষ সূর্যের রশ্মির আলোয় সতীশ পূর্ণ দৃষ্টি মেলে অনুভাকে দেখল। তার মনে হতে লাগল অনুভার চোখের তারায় তারায় সৌন্দর্যের ফুল লীলায়িত ছন্দে তার প্রাণকে ভাসিয়ে নিতে আসছে।

অনুভার হৃদয় দুলে ওঠে। সে অনুভব করে একজোড়া পুরুষ হাত তাকে ক্রমশ অবসন্নতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সে সতীশের দিকে তাকিয়েই ডাকল,

—সতীশ!

সতীশ অনেক দূর থেকে ফিরে এল। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলল,—আমি হারিয়ে গেছিলাম।

অনুভা একটু মৃদু হেসে বলল,

—জানতে পারি কোথায়?

ঃ একজোড়া নীল সাগরে।

ঃ কী পেলে?

ঃ পাইনি, দেখলাম।

ঃ কী দেখলে?

ঃ প্রেম সাগর—সেখান থেকে শুধু সৃষ্টি হচ্ছে লীলায়িত বিচিত্র ফুল।

ঃ ওই ফুল পেতে চাও না?

ঃ ও ফুল আমার জন্য নয়।

ঃ সব কিছুর আয়োজন মানুষের জন্যে। যে মানুষ সাহসী সে অনেক কিছু পায়।

ঃ সে পাওয়ার মধ্যে গৌরব নেই, অনুভা।

অনুভা কোনো উত্তর দেয় না। সে তাকায় সতীশের দিকে। যে মানুষটি

মাথা নিচু করে চলে, কোনো মেয়ের সঙ্গে অপ্রয়োজনে কথা বলে না, যে মানুষটির মুখাবয়ব দেখে অনুমান করা সম্ভব হয় না, এ একজন রোমান্টিক, পরিবর্তে, মনে হয়, এ একজন নিরুত্তাপ মানুষ—অথচ, সেই মানুষটির অন্তর ভাবের সমুদ্রে পরিপূর্ণ। অনুভা মুগ্ধ হয়।

সতীশ বলল,—অনুভা বলো, কেন ডেকেছ?

অনুভা সতীশের দিকে তাকায়। বলে, যদি বলি, তোমার সঙ্গে একটি ভাবের সম্পর্ক গড়ে তুলবো বলে ডেকেছি, বিশ্বাস করবে?

ঃ অবাক হচ্ছি।

ঃ কেন?

ঃ আমার সে যোগ্যতা কোথায়?

ঃ নিজেকে এতো ছোটো করে দেখতে নেই।

ঃ জানি। অনুভা! একটা কথা বলবো?

ঃ বলো।

ঃ তুমি সুন্দর। বিয়ে করোনি কেন?

ঃ সতীশ, মেয়ে দেখতে সুন্দর হোলেই বিয়ে হয় না। আমাদের সমাজে নারী হয়ে জন্মানো অভিশাপ। তোমারও তো বিয়ে হয়নি। করোনি কেন?

সতীশ অনুভার দিকে তাকায়। চোখ সরিয়ে নেয়। তার বুক চিরে একটি দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসে। অনুভা অনুভব করে সতীশ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। সতীশ ধীরে ধীরে বলল,

—আমি ভীষণ কদাকার—ভয়ঙ্কর কুৎসিত, তাই বিয়ে হয়নি।

অনুভা বলল,—এভাবে বলো না। সতীশ, কে বললো তুমি কদাকার, কুৎসিত। নিশ্চয়ই কোনো নেপথ্য ঘটনা আছে—যে ঘটনার অস্ত্রধারায় তুমি ক্ষত-বিক্ষত। বলবে?

ঃ বলবো। আজ নয়। আজ তোমার কথা শুনতে এসেছি। তুমি বলবে, আমি শুনব। তোমার কথা শুনে মনে হয়েছে, তোমার জীবনে এমন কিছু ঘটেছিল যার জন্য তোমার বিয়ে হয়নি।

অনুভা সতীশের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল,—আমি লগ্ন-ভ্রষ্টা।

ঃ লগ্ন-ভ্রষ্টা! এ-তো কুসংস্কার। অবশ্য এই সংস্কারই আমাদের পুরুষ সমাজকেও পঙ্গু করে রেখেছে। ঘটনাটি বলো, আমি শুনব।

ঃ লগ্ন-ভ্রষ্টা মেয়েকে বিয়ে করলে অকল্যাণ হয়—এই মতাদর্শে আমরা নারী-পুরুষ সবাই বিশ্বাসী। অবশ্য এর মধ্যেও ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। বিতর্কমূলক আলোচনা থাক, আমি ঘটনাটি বলি, কেমন করে আমাকে লগ্ন-ভ্রষ্টা করা হোল।

সতীশ কোনো উত্তর না দিয়ে অনুভার দিকে তাকায়। অনুভার একবার সতীশের দিকে তাকিয়ে, পরক্ষণে দৃষ্টিকে গঙ্গার স্রোতোধারার ওপর স্থির করে বলল,—তুমি এই কলকাতার অফিসে এসেছ দু'বছর হোল—আরও একবছর আগের ঘটনা—এককথায় তিন বছর আগের। অনুভা বলতে শুরু করেছে।

—একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভ-র সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছেলেটির নাম বরেন মজুমদার। প্রথম থেকেই ওর ব্যবহার আমার ভালো লাগেনি। অপছন্দ করলে চলবে কেন। ছেলে কোথায়? আমি বক্ষের বিশেষ একটি জায়গায় গোলাকৃতি ছোটো একটি সাদা দাগ আছে। শ্বেতী। সাধ্যমতো চিকিৎসা করিয়েছি, সারাতে পারিনি। তবে ডাক্তার বলেছে, এ থেকে ভয় পাবার কিছু নেই, ছোঁয়াচে নয় এবং ভবিষ্যতে সারার লক্ষণও নেই। তাছাড়া, ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। কার্ড ছাপানো হয়েছে। নিমন্ত্রণ করার কাজও শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে বিয়ের কেনাকাটা। একদিন সন্ধ্যার সময় বরেন এসে উপস্থিত। প্রয়োজন আমার সঙ্গে। আমি ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল,—আমি বসবো না, তোমাকে একটি কথা বলতে এলাম।

ঃ বলুন।

ঃ কাল বিকেলে তোমাকে নিয়ে বেড়াব, তোমার বাবাকে বলেছি, তোমার আপত্তি আছে?

ঃ যাবো।

ঃ কাল বিকেল চারটের সময় মেট্রো হল-এর সামনে অপেক্ষা করব। এসো।

ঃ আচ্ছা।

বরেন চলে গেল। রাত্রে আমার ভালো ঘুম হোল না। সমস্ত রাত দুশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে কেটে গেল। চারটের সময় নির্ধারিত জায়গায় উপস্থিত হলাম। বরেন হেসে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে,

—তোমাকে খুব মিষ্টি লাগছে।

আমি কোনো উত্তর দিই না। সলজ্জে ওকে অনুসরণ করি। ওর সঙ্গে আউটরাম ঘাটে আসি। একটি ফাঁকা বেঞ্চির ওপর দু'জনা বসি। ও আমার একটি হাত টেনে নিয়ে বলল,

—অনুভা, আমি ভাগ্যবান পুরুষ।

আমি সন্তর্পণে হাতখানি সরিয়ে নিয়ে বললাম,—কেমন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন?

বরেন মৃদু হেসে বলল,—আজ পাচ্ছি কুমারী মনের পরশ, আবার ক'দিন বাদেই পাব বধূমনের অনুরাগ।

ও হাসল। আমিও মৃদু হাসলাম। ও আমাকে রেস্টুরেন্টে না খাইয়ে ছাড়ল না। আমাকে বাসে তুলে দেবার আগে বলল,—আগামী পরশু শুক্রবার আবার এসো। চারটের সময়। মেট্রোর সামনে।

আমি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে

With best wishes from-

Banchharam

Kolkata, Howrah, Bangalore

With best compliments -

A
well
wisher

বাসে উঠে বসলাম। দুর্ভাবনার ভেতর দিয়ে সময় কাটছে। আর অস্বস্তির ভেতর দিয়ে চলেছে আমার পদচারণা।
শুক্রবার বিকেলে বরেন আমাকে নিয়ে গেল একটি রেস্টুরেন্ট কামরায়। একটি ছোটো ঘরে আমরা দুজন বসলাম। নিরালা। অন্য কেউ এই ঘরে বসতে পারবে না। আমাকে বসিয়ে রেখে বরেন বাইরে গেল, কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে বলল, —তোমার কি খারাপ লাগছে, অনুভা?
আমি কোনো উত্তর না দিয়ে একটু হাসলাম। বরেন আবার বলল, —বিশেষ বিশেষ দিনে আমি একটু খাই। তুমি পছন্দ না করলে বিয়ের পর ছেড়ে দেব।
তারপর বরেন আমার দিকে তাকিয়ে বলল,—এ কী অনুভা! এই শীতেও তুমি ঘামছো?
বরেন পকেট থেকে রুমাল বার করে আমার ঘাম মোছাতে আসে। আমি সামান্য সরে গিয়ে বললাম,—ও কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে।
ও সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, —তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করব—যার জন্য এখানে আসা।
ঃ বলো।
ঃ তোমার শ্বেতী কোথায়?
আমি সলজ্জে বললাম,—বুকের পাশে।
ঃ ভালো করে বলো, লজ্জা কি?
আমি সংকোচকে দু'হাতে সরিয়ে মনকে দৃঢ় করে বললাম,—ডান স্তনের নিচের দিকে।
আমার কথা শোনার পর ও উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার কাছে এগিয়ে এসে, আমার কাঁধকে স্পর্শ করে বলল,—আমার কাছে তোমার লজ্জা কিসের, দাগটা দেখাও।
কী আস্পর্ধা! বরেন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছে। ওর ভেতরকার কদাকার আমি'টা বাইরে বার হয়ে এসেছে। ওর উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। আমি ওকে সরিয়ে দ্রুত পর্দা ঠেলে রেস্টুরেন্টের বাইরে, রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালাম, ও-ও আমাকে অনুসরণ করে। আমি বললাম,—বাড়ি যাব।
বরেন বলল,—তুমি এতো উত্তেজিত হবে জানতে পারলে জিজ্ঞেস করতাম না। আমি দুঃখিত। শোন—এসব বাড়ির কাউকে বোল না। তোমাকে খারাপ ভাববে।
আমি অনেকখানি সংযতা হয়ে বললাম,—আমাকে ভুল বুঝো না।
বরেন হেসে নির্লজ্জের মতো বলল, —বিয়ের পর সুদে-আসলে উসুল করব।
আমি উত্তর দিই না। একথার উত্তর হয় না। বাস আসে। অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা পাই।
বিয়ের দিন। আলো জ্বেলে ওঠে। আত্মীয়, স্বজন এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের আগমনে বিয়ে বাড়ি সরগরম। এক সময় বাবা-মা এবং আমার আনন্দে দুর্ভাবনা স্থান করে নেয়। আনন্দিত মন বিষাদে নিমজ্জিত হয়। বর এবং বরযাত্রী কেউ-ই আসে না। যারা বর আনতে গেছিল তারা খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এল। বর তাদের বলেছে,—''মেয়ের শ্বেতী আছে, তাকে আগে জানানো হয়নি, এ বিয়ে সে করবে না!'' আমার চোখের জলের সঙ্গে বিয়ের শেষ লগ্ন বয়ে গেল।
অনুভা থামে। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারেনা। একসময় সতীশ অনুভার দিকে তাকিয়ে বলল,—ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।
অনুভা বলল,—হয়তো তাই। আমার কথা সব তোমাকে বললাম। এবার তোমার কথা শুনব। কেন তখন নিজেকে কদাকার, কুৎসিত বললে? এর পিছনে নিশ্চয় কারণ আছে।
ঃ আছে। অনুভা, আজ বলবো না। অন্যদিন। চলো উঠি।
উঠে হাঁটতে হাঁটতে অনুভা বলল, —সময় কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।
সতীশ বলল,—একটি সুন্দর অনুভূতি নিয়ে ঘরে ফিরছি। ও, হ্যাঁ, আগামী সোমবার ছুটি আছে। দশটার সময় বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রবেশ পথে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। ওইদিনই আমার পুরোনো দিনের কথা তোমাকে বলব।
অনুভা ঘাড় কাত করে বলল,—ঠিক আছে।
সতীশ অনুভার সঙ্গে বেলুড় মঠ থেকে বার হয়ে আসে।
অনুভা ঠিক সময়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ এসে পৌঁছালো। সতীশ তার জন্যে আগের থেকেই অপেক্ষা করছিল। অনুভাকে নিয়ে সতীশ ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে বলল,—অনুভা, আমাদের সামনে তিনটি পথ—কোন পথ দিয়ে যাবে।
অনুভা মৃদু হেসে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে উত্তর দিল,—আমার সঙ্গে এসো। মধ্যকার পথ ধরে গেলে অরণ্যের গভীরতা পরিমাপ করতে পারব।
ঃ বেশি গভীরতা ভয়ের কারণ।
ঃ বুঝতে পারলাম না।
ঃ আমি অরণ্যের কথা বলছি, চলো, বোসো, তারপরে অরণ্যের অভিজ্ঞতার কথা বলবো।
ঃ সেই ভালো।
ওরা দুজন নির্জন গাছের ছায়ায় কোমল দূর্বাঘাসের ওপর বসে। ওদের কাছে-পিঠে কোনো মানুষের মুখ চোখে পড়ে না। ওদের চতুর্দিকেই বড়ো বড়ো গাছ-গাছালি আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে

আছে। ক্লান্তি-শ্রান্তি ভুলে মানুষের সেবায় নিয়োজিত ওরা।
অনুভা সতীশের চোখের দিকে তাকায়। ওর চোখ চঞ্চল নয়, অস্থির নয়, শান্ত। আর আছে দীঘির জলের গভীরতা। অনুভা চোখ সরিয়ে ঘাসের ওপর নিবদ্ধ করে বলে,
—সতীশ, তোমার কথা বলো। তোমার কথা না শোনা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।
ঃ অনুভা বলব। বলার জন্যই তোমাকে এই বনভূমিতে আমন্ত্রণ করে এনেছি। প্রথম সন্ধ্যায় তপতীর ভেতর দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসার বৃক্ষ প্রত্যক্ষ করেছিলাম, আবার দ্বিতীয় সন্ধ্যায় ওই তপতীর ভেতর দিয়েই প্রকটিত হয়েছিল আমার ভয়ঙ্কর কুৎসিত রূপ।
অনুভা হাঁটু দু'খানিকে নৌকার মতো করে, ধীরে ধীরে বলল,—কীরকম?
ঃ বললেই বুঝতে পারবে। তপতী আমার অনেক কাছে এসে গেছে, আমি-ও ওর হৃদয়ের অর্গল খুলে দিয়েছি। দু'জনাই দুজনের অর্গল উন্মুক্ত করে দিয়েছি। ঝর্ণার মতো বেগ নিয়ে ওর হাত ধরে ছুটেছি, ও-ও ছুটেছে। ছোটার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠলো প্রেম।
অনুভা তাকিয়ে আছে সতীশের দিকে। সতীশের বলার মধ্যে ও কোনো কথা বলে না। নীরবে চোখ মেলে, কান পেতে শুনতে থাকে সতীশের কথা।
—একদিন আমরা একটা পার্কে বসে আছি। কথা খুব কম বলছি। আমি তপতীর আঙুল নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম,—তপতী, কিছু বলছ না।
ঃ উপভোগ করছি। অনেক কিছু আছে, যা মন আর হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। শব্দে তা নষ্ট হয়ে যায়।
ঃ ঠিক বলেছ তপতী, আমিও তোমার ভালোবাসার অনুভূতি আমার হৃদয় দিয়ে অনুভব করে অনাবিল আনন্দ পাই।
ঃ তোমার বুকে আমি যখন মাথা রাখি তখন মনে হয় আমি সংশয়মুক্ত, আমি নিশ্চিন্ত।
আমি উত্তর দিই না। ক্রমশ সন্ধ্যার অন্ধকার আমাদের ওপর দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তপতী আমার বুকে মাথা রাখতে রাখতে বলল,—তুমি আমাকে একটা কথা দেবে?
ঃ কী?
ঃ বিয়ের পর, আমি সব কষ্ট সহ্য করব, তুমি শুধু আমাকে ভালোবাসবে।
ঃ তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো। আমি চেষ্টা করবো তপতী। তোমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে সবরকম চেষ্টা করব।
রাত বাড়ে। তপতীকে নিয়ে উঠে দাঁড়াই। ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার আগে বললাম—কাল সন্ধ্যার সময়

তীর্থক্ষেত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে আচার্য প্রণবানন্দ ছিলেন নিশ্চিন্তে। সংস্কার কার্যের মাধ্যমে তিনি তীর্থগুলিকে তাহাদের গৌরবপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাই, যুগমানবের মানস নেত্রে সংস্কৃত তীর্থক্ষেত্রসমূহে স্বর্গীয় চিত্রটি নিশ্চয়ই ফুটিয়া উঠিত ; কোন তীর্থে সৌনক মুনি দশ সহস্র শ্রোতার সামনে পুরাণ পাঠ করিবেন। কোন তীর্থে সুত মুনি ঋষি সমাজকে আহ্বান করিবেন শাস্ত্রালোচনার জন্য। অন্য কোথাও রাজর্ষি জনক স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গগাভীগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া যাজ্ঞবল্ক-গার্গী আদি ব্রহ্মবাদীকে আমন্ত্রণ জানাইবেন ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা জন্য। কোনো শ্রদ্ধালু রাজা পরীক্ষিত শুকদেবের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিবেন। কোন তীর্থে দীর্ঘতম্মা ঋষি বৈদিক বিজ্ঞান প্রসঙ্গে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, অগ্নিচয়ন বিদ্যা সংবৎসরাগ্নি তত্ত্ব, সোমতত্ব আদি বিষয়ে বেদবিদ্যার্থীদের শিক্ষা দেবেন।

স্বামী নির্মলানন্দ বিরচিত

"শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ শতরূপে শতমুখে"

প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯

সৌজন্যে : জনৈক উৎসাহী গ্রাহক

সরকারি আধিকারিক

আমার বাসায় এসো। তপতী সম্মতি জানিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। আমি একা একা তপতীর কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরলাম।

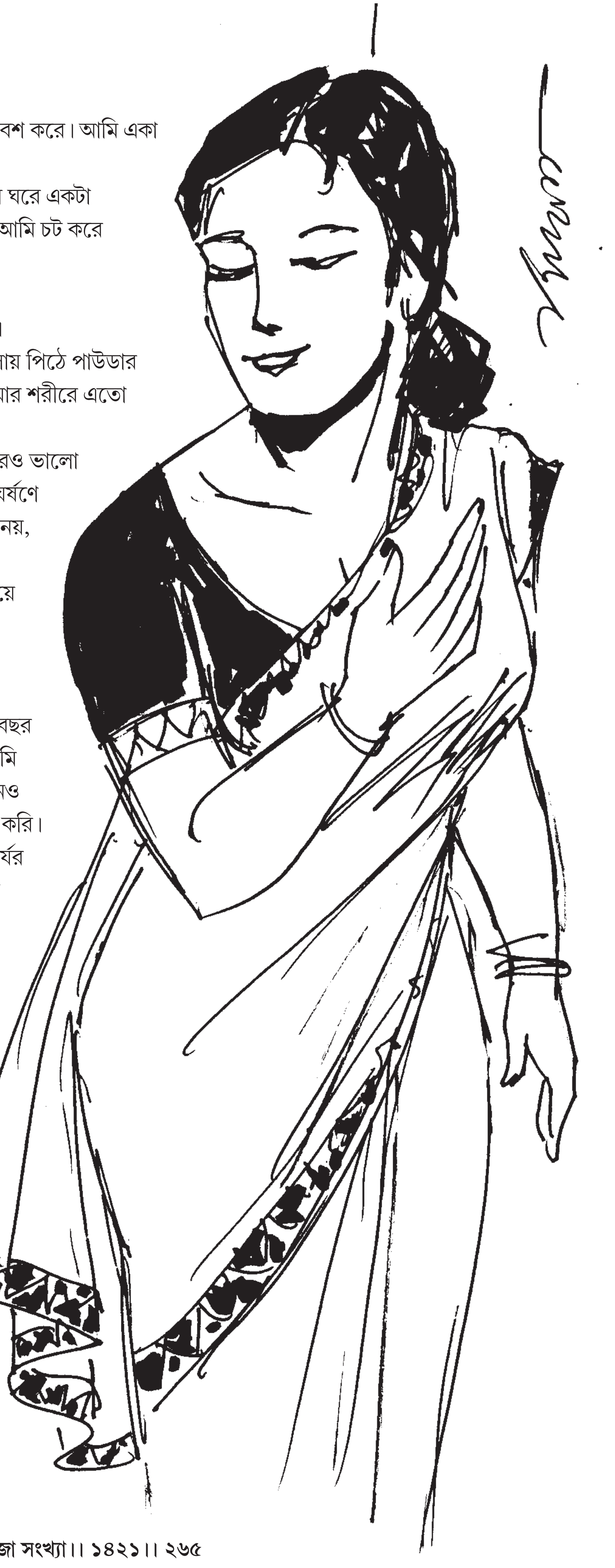

বাড়িতে কেউ নেই। আমি একা। তপতী এলো। ও আমার ঘরে একটা চেয়ারে বসল। আমি ওর কাছে এগিয়ে এসে বললাম,—আমি চট করে হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

ঃ এসো।

দিনের খবরের কাগজটা ওর হাতের কাছে রেখে গেলাম।

হাত মুখ ধুয়ে মুখ মুছে যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় পিঠে পাউডার ঢালছি তখন তপতী বিস্ময়ের সঙ্গে বলল,—সতীশ, তোমার শরীরে এতো দাগ কিসের? তারকাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার মতো।

আমি ওর কাছে সরে এসে আমার শরীরের দাগগুলো আরও ভালো করে দেখালাম। বুকের দু'পাশে, দু'পায়ের ওপর দাঁতের ঘর্ষণে চামড়ার ক্ষত-বিক্ষত রূপ দেখিয়ে বললাম,—তারকাঁটায় নয়, সাপের দাঁতে এই অবস্থা হয়েছে।

ও শিউরে ওঠে। চোখ আমার শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে বলল,—এই অবস্থা কী করে হয়েছে?

ঃ তোমার না শোনাই ভালো, ভয় পেতে পারো।

ঃ আমি শুনবো। বলো।

আমি পাঞ্জাবি গায়ে গলিয়ে ওর মুখোমুখি বসে বললাম, বছর দুই আগে, অরণ্যের ভেতর ঘটনাটি ঘটে। মাঝে মধ্যে আমি এদিক-ওদিক ঘুরে বনের অবস্থা তদারকি করতাম। সেদিনও আমি দুপুরবেলা অফিস থেকে বার হয়ে বনান্তরে প্রবেশ করি। অরণ্যের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা। কারণ প্রত্যেকটি গাছ সূর্যের আলোর স্পর্শ পেতে আকাশের দিকে উঠে গেছে। ভীষণ নিস্তব্ধতা। অরণ্যের গভীরতায় বুকের ভেতরে ভয় ভাব জেগে ওঠে। মাঝে মধ্যে বন্যপ্রাণীদের বিচরণের শব্দ, পাখিদের স্থান পরিবর্তনে পাখার ঝাপটায় দু-একটা পালক খসে পড়ে, কখনো পাতা এবং ডালের ফাঁক দিয়ে মাটির ওপর এসে পড়ে, কখনো অনেক ওপরে পাতার ওপর ভাসতে থাকে। কখনো চোখ যায় হাতির যূথ-র দিকে যারা আপন মনে বিহার করছে। আমার উদ্দেশ্য বন দেখা নয়, শিকারিদের হাতে পশুবলি হয় কিনা—তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। মনুষ্য পায়ের শব্দে আমি সচেতন হই। পায়ের শব্দ আমার কাছে এগিয়ে আসে। কয়েকজন শিকারি বে-আইনিভাবে ঢুকে পড়েছে। কিছু বলার আগেই ওদের একজন আমার মাথায় আঘাত করে। ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। মাটির ওপর পড়ে যাই। আমি জ্ঞান হারাই।

বেশ কিছুক্ষণ পর আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম।

আমি উঠতে পারছি না। দাঁড়ানোর সবরকম পথ বন্ধ। আমাকে কোনো কিছু ক্রমাগত গ্রাস করছে। মাথাটা ঘুরিয়ে দেখতেই চমকে উঠলাম। বিশাল একটি ময়াল আমাকে তার খাদ্য করে তুলেছে। ধীরে ধীরে আমার শরীর তার মুখের ভেতর দিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকছে। আমি বার হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। সর্বস্ব শক্তি এক করে, দুহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে, জলে সাঁতার কাঁটার মতো হাত সঞ্চালন করতে থাকি। আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থতার দিকে এগোতে থাকে। চিৎকার করতে থাকি, বাঁচাও—বাঁচাও—ময়াল সাপ আমাকে গিলে ফেলল— বাঁ— পায়ের দিক থেকে কোমর পর্যন্ত ময়ালের ভেতর চলে গেছে। আমি শক্তি হারিয়ে ফেলছি। অনবরত চিৎকার করতে করতে আমার গলা ব্যথা হয়ে স্বরশক্তি কমে যাচ্ছে। আমার বুক তার বিরাট মুখ গহ্বরে এসে গেছে। বাঁচার কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না। তার ওপর আমার শরীর উপুড় হওয়া। হাত দিয়ে বার বার মাটিকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছি। বৃথা। আমার বুকও তার মুখের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করছি—বাঁচাও—বাঁচাও—। যখন আমি বাঁচার আশা ত্যাগ করেছি তখনই কিছু মানুষের কোলাহল আমার কানে এল। বেশ কিছু মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের কারোর হাতে লাঠি, সড়কি, বল্লম ইত্যাদি আত্মরক্ষার অস্ত্র। তারা সবাই ফরেস্ট অফিসের কর্মী। আমার সন্ধানেই তারা এই রণস্থলে উপস্থিত হয়েছে। তারা সবাই অস্ত্রের সাহায্যে ময়ালকে প্রতিনিয়ত আঘাত করতে লাগল। তাদের সমবেত আঘাতে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। অগত্যা তিতিবিরক্ত হয়ে আমাকে উগরে দেয়। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ওরা অচৈতন্য অবস্থায় আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠি।
আমার কথা শেষ হতে না হতেই তপতী উঠে দাঁড়ায়। চোখ বিস্ফারিত করে বলে ওঠে,—আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমাকে ভীষণ কদাকার, কুৎসিত লাগছে, তোমার সারা শরীরে সাপের দুর্গন্ধ। আমার বমি আসছে, আমার গা গুলোচ্ছে...সতীশ, তোমাকে মানুষ মনে হচ্ছে না, তুমি সরে যাও—।
তপতী চিৎকার করে ঘর থেকে বার হয়ে যায়। আমি নিশ্চল পটে আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকি।
ভালোবাসা আমাকে ভেংচি কাটতে থাকে।
তপতীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আমি-ও দেখা করিনি, প্রয়োজন মনে করিনি। সেই ঘটনার ছ'মাস পরেই কলকাতায় বদলি হয়ে আসি। অনুভা, এই আমার কদাকার হবার নেপথ্য কাহিনি।
সতীশের কথা শেষ হবার পর অনুভা সতীশের কাছে এগিয়ে আসে। সতীশের চোখে চোখ রেখে বলে,
—আমার একটি অনুরোধ রাখবে?
ঃ বলো।
ঃ তোমার জামা আর গেঞ্জিটা খুলে ফেলো।
সতীশ অবাক হয়। মুখে কিছু বলে না। অনুভার কথামতো জামা, গেঞ্জি খুলে ফেলে। অনুভা ওর একেবারে বুকের কাছে সরে এসে, কোমল হাত তার সারা বুকের ওপর সঞ্চালন করতে থাকে। সতীশ বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে। অনুভা হাত সঞ্চালন অব্যাহত রেখে বলে,—সতীশ, তুমি সুন্দর, তুমি কদাকার ন-ও।
সতীশ হাত বাড়িয়ে অনুভার পিঠে স্থাপন করে বলে,—অনুভা, তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না করো, আমি তোমাকে কোনোদিন ত্যাগ করব না।
অনুভা সতীশের বুকে ধীরে ধীরে মাথা রেখে ফিসফিস করে বলল,
—সতীশ, তুমি যে আমার হৃদয়ের বড়ো ভাব, বড়ো ভাবকে কখনও-ই ত্যাগ করা যায় না।...

With best compliments -

A well wisher

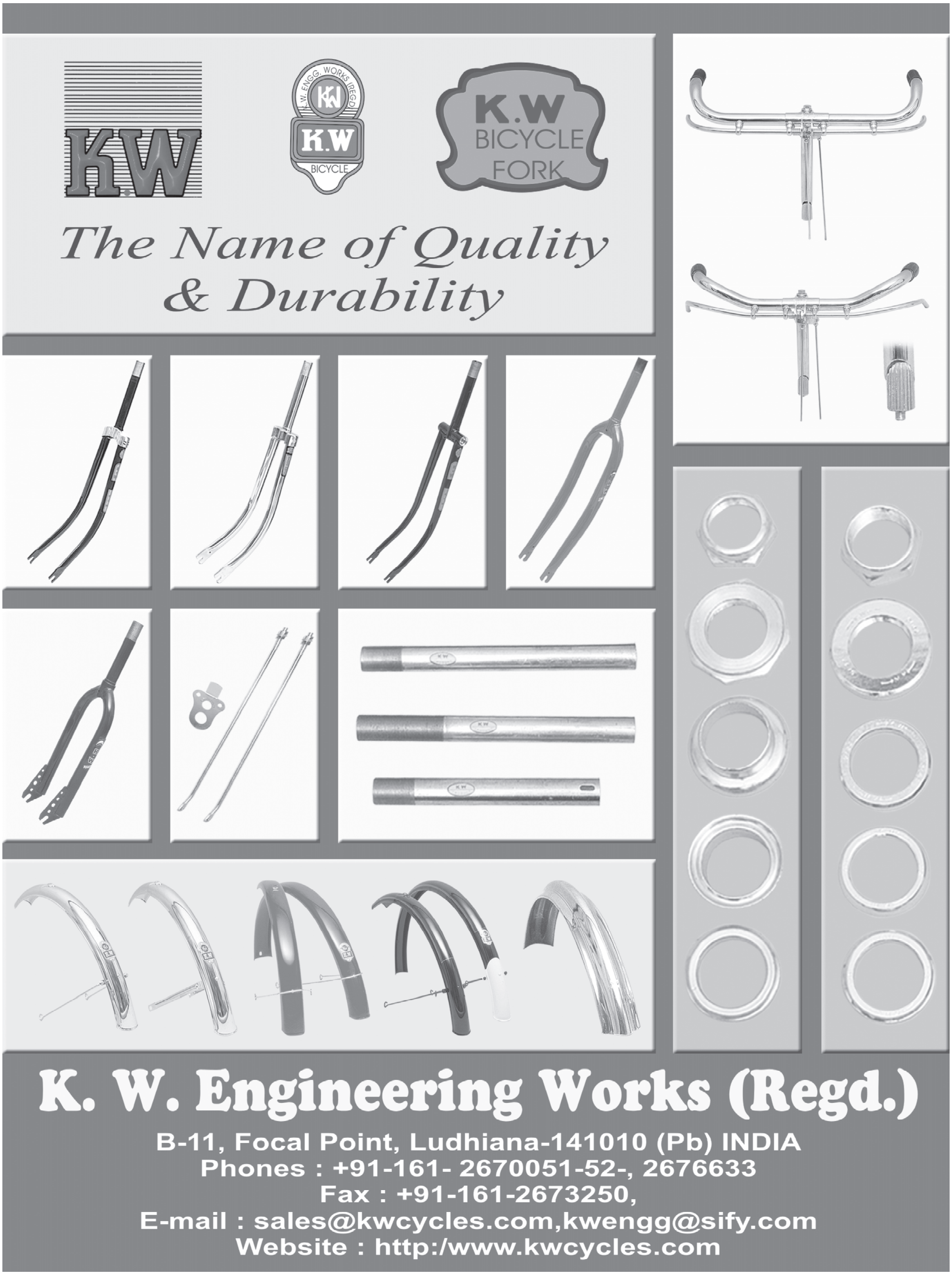
K.W
K.W. ENGG. WORKS (REGD)
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

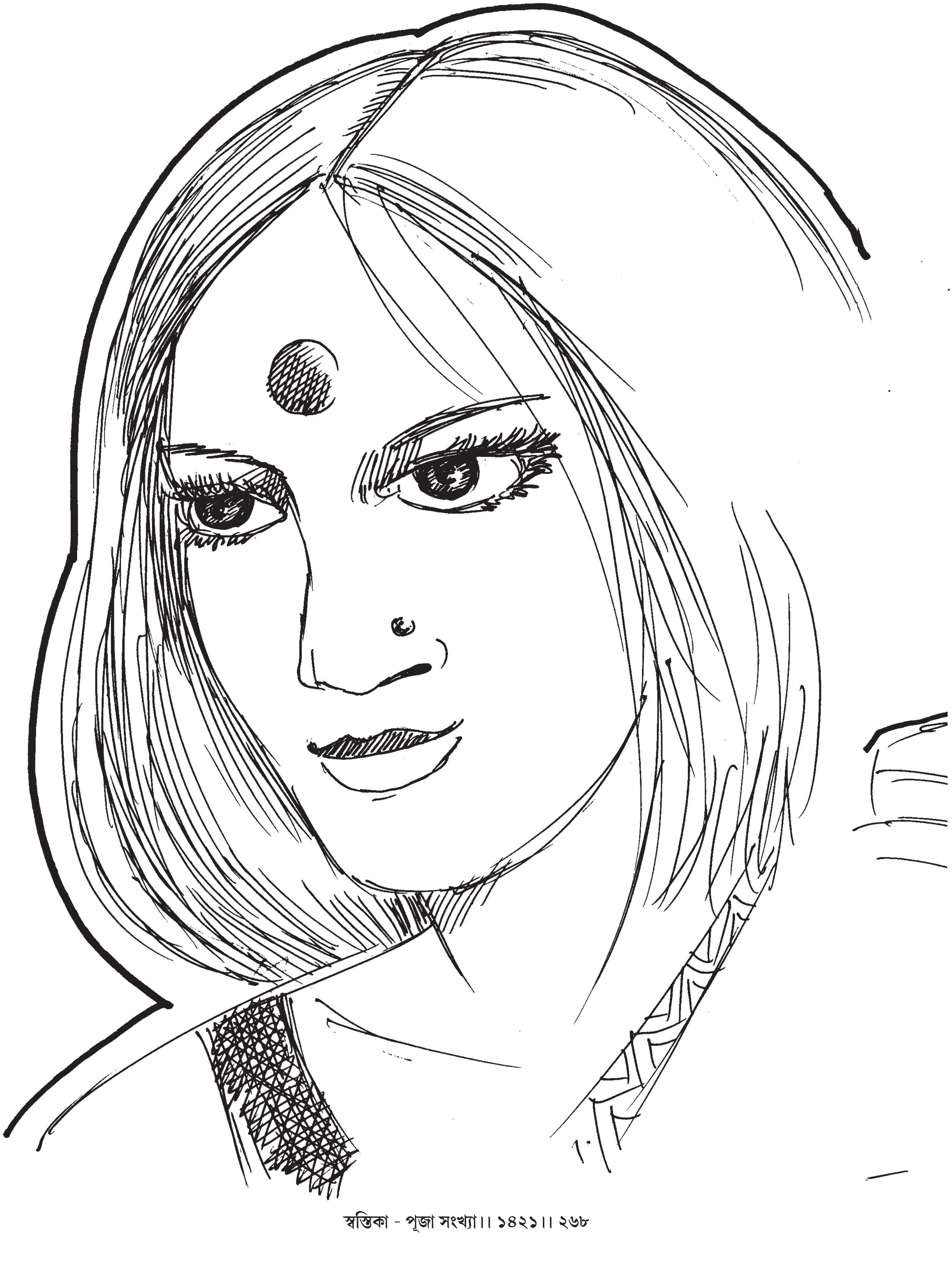

উপন্যাস

হীরের আংটি

সৌমিক ঘোষ

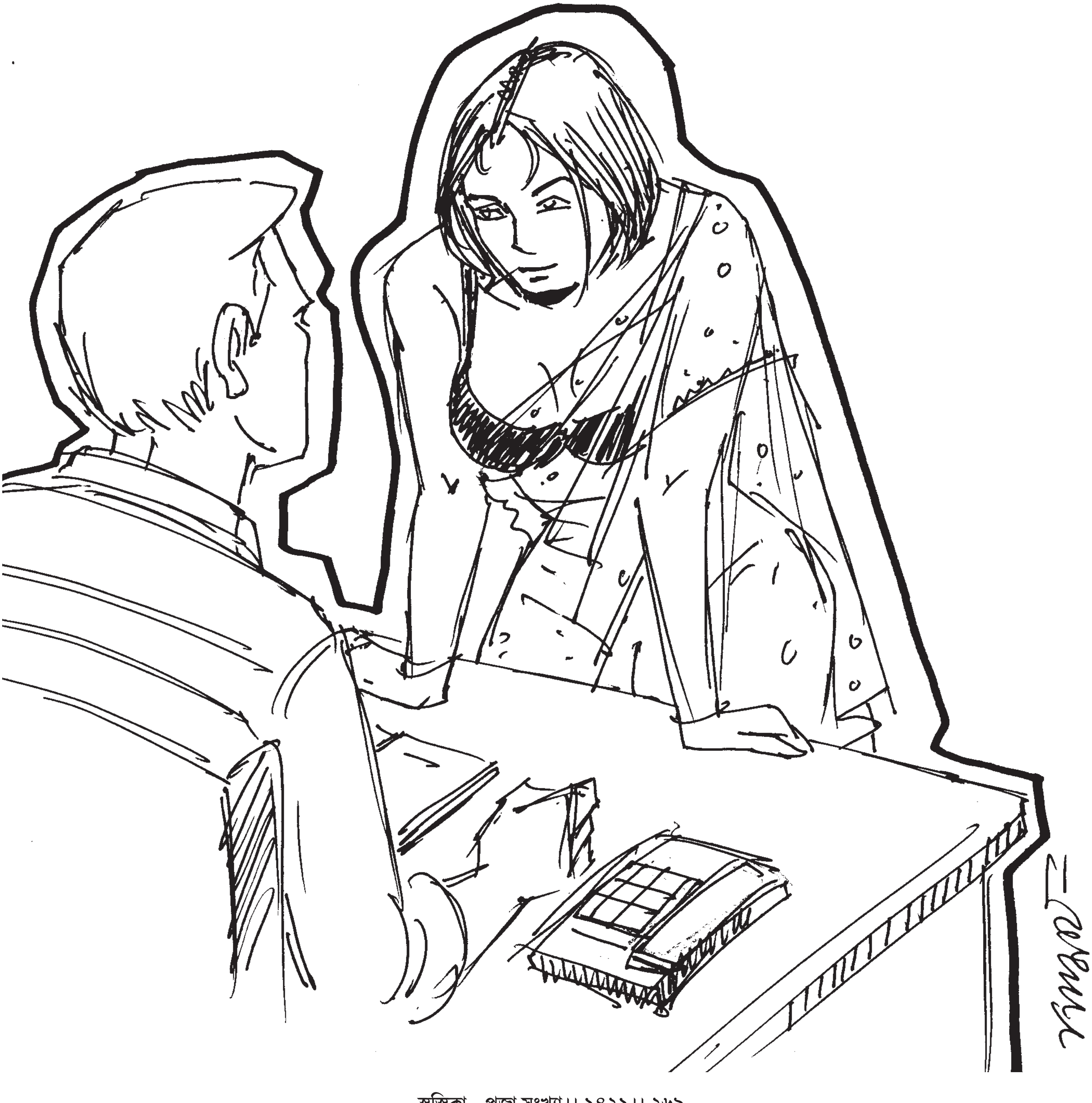

কোনো এক মফস্‌সলের বাংলো মাধ্যম স্কুল। ইংরাজির ক্লাস।

—রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট ইওর এম ইন লাইফ।

—স্যার, এখনই লিখতে হবে?

—এখনই দেখবেন স্যার?

—ইয়েস, আই উইল চেক অ্যান্ড সাইন ইট টুডে। আদারওয়াইস ইউ উইল নট গেট পারমিশান টু গো হোম অ্যাট ফোর থার্টি।

ব্যস, সব ক্লাস চুপ। একটু ফিসফাস, ঠেলাঠেলির মাঝে খাতা ভরে যায় এ.বি.সি. ডি.-এর লাইনে।

স্টপ রাইটিং। টাইম ইজ আপ। প্লিজ, সাবমিট ইওর কপিস্‌, ঝুপঝাপ করে খাতা জমা পড়ল, মাথাগুলো আড়াল রেখে।

—স্যার, মে আই গো টু টয়লেট প্লিজ?

—ইয়েস, ইউ ক্যান। অমিত ক্লাস থেকে বেড়িয়ে যায়। প্লিজ কিপ সাইলেন্স, হোয়াইল আই উইল চেক ইওর কপিস্‌।

তবু ক্লাসে একটা হালকা গুঞ্জন হচ্ছিল। আপাতগম্ভীর সুমন মুখার্জী খাতা দেখছেন। হাবভাব যেন কলেজের লেকচারার। ক্লাসে ইংরাজিতে কথা বলতে ভালোবাসেন।

লেখার ধরন দেখে কখনও হতাশ, আবার উচ্ছ্বাস, কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ঘোষণা—সৌরক বোস, ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল। ওঃ! হোয়াট এন এম ইউ হ্যাভ!

ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা এক সঙ্গে জানতে চায় সৌরক কী লিখেছে।

—প্লিজ, ডোন্ট টক। আই হ্যাভ নেভার হার্ড অ্যাবাউট অ্যান এম টু বি এ নেচার লাভার। হি মেনশনড্‌ দ্য চিপকো অ্যান্ড সাইলেন্ট ভ্যালী মুভমেন্ট উইথ দ্য টাচ অফ সেলিম আলি টু গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান।

ক্লাস শেষের ঘণ্টা বাজায়—ব্যাগ নিয়ে দে ছুট। বন্ধুদের মাঝে সেদিন সৌরকের ফান্ডা বেশ মুচমুচে ঝালমুড়ি।

—আরে ধূর, স্যার নিজে না ঘেঁটে আমাদের...

—আর, তুইও একেবারে ঘেঁটে দিলি! লীনা মনে মনে ভাবে ইংরাজি রাইটিং-এর খাতাটা পেলে একবার হয়। সব কপি করে নেবো। কিন্তু হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। বাকিরা সব টা-টা। চড়কিতলা মোড় থেকে এই নির্জন রাস্তায় প্রতিদিনই ওরা কেবল দুজনে একা ফেরে। মাকড়সা দেখে লীনা খুবই ভয় পায়। ও প্রায় রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায়। রাস্তায় দু'পাশে ঘন ঝোপঝাড় আর বে-আক্কেলে ডালপালা এগিয়ে থাকে। হুশ করে মোটর সাইকেল যায়। সৌরক চেঁচিয়ে ওঠে—কী হচ্ছে কী? লীনা? মন্দিরের স্মৃতিফলক হয়ে যাবি। লীনা চমকে রাস্তার ধারে। একটা জংলি পাতার ডাল মুখের সামনে।

সৌরক শুধু বলে—লীনা, মাকড়সা!

এক ঝটকায় লীনা মুখটা ঢাকে সৌরকের বুকের মাঝে। জোরে জোরে শ্বাস। দেহটা শক্ত। সৌরক আশ্বস্ত-এর বাঁধনে লীনাকে আগলে রাখে, ওই নির্জন মুহূর্ত। ফাঁকা শহরতলির রাস্তার সৌরক আর লীনা পড়ন্ত বিকালে একে অপরকে হয়তো বিশ্বাস করে। অবয়ব আর ছায়া আলো-আঁধারিতে মিশে যায়। সৌরক ভাবে এভাবে যদি লীনা সারাজীবন ওর বুকের মাঝে থাকে, তাহলে জীবনটাই অন্যরকম। ও বকবক করবে আর আমি চুপ করে শুনব।

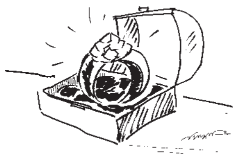

—কিরে? আজ একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হল বুঝি।

—হ্যাঁ মা। এক পিরিয়ড আগেই শেষ।

—রেডি হয়ে নে। আমি টিফিন দিচ্ছি। আবার তো পড়তে যাবি?

—জানো মা, আজ ক্লাসে সুমন স্যার আমার নাম ডেকে কী প্রশংসা করল।

—তুই নিশ্চয়, ভালো কিছু করেছিলি।

—ধুত, শুধু টিভির প্রোগ্রামে দেখে, একটু মনে ছিল। ব্যাস লাগিয়ে দিয়েছি।

—আচ্ছা, এখানে এই স্কোয়ারটা লাগানো হল কেন? লীনা এমনভাবে সৌরকের খাতার দিকে পেন সমেত হাতটা এগোলো যে, সদ্য ফোটা কিশোরীর মাধুর্যের ছোঁয়ায় সৌরক বেশ মজা পায়। কিন্তু রাজুদার চোখ এড়ায় না।

—লীনা, তোর এ্যাত হামলে পড়ার কী আছে? আমি কী এখনও এই মাধ্যমিক লেভেলে...

—না, রাজুদা বুঝেছি।

—তুই থাম্‌ তো সৌরক। সব সময় পণ্ডিতি। সৌরক মাথাটা নীচু করে নেয়। সায়ন, রমেন, তপন, সুশান্ত, অমিত সব চুপ।

লীনা রাজুদাকে মনে মনে ভেংচে বলে—দেখাওনি কেন? সবাই সবকিছু কী বুঝতে পারে? এই সৌরভ কী বুঝতে পারছে?—আমি ওর কাছ থেকে আবার খাতাটা নেবো। ও বুঝিয়ে দেবে...

—তোরা সব বুঝেছিস? এখানে একটা স্টেপ জাম্প করা হয়েছে। এই গুণটা দেখানো হয়নি।

—আঃ ছেলেটার কত গুণ! যেমন ব্যবহার তেমনি পড়াশোনা।

—তুমি থামো তো মা। তুমি আবার কী গুণপনা দেখলে? পরীক্ষায় তো তো আমার থেকে ক'টা নম্বর বেশি পেয়েছে।

—এই বেশিটাই কায়দা করে আদায় করো। বড়ো হয়েছো। এবার কাজের হও।

—আদায়ের আবার কী আছে? নোটস্ আর বই, ও একটু ছোঁয়াতেই পেয়ে যাই।

—শুধু পেলে হবে না, মাধ্যমিকের হার্ডলটা টপকাতে হবে।

—কী হবে? মাধ্যমিকের একটা চোতা পেয়ে?

—পিঁড়িতে সেঁটে দেবো। সাতবার ঘুরিয়ে কলাগাছের পাশ দিয়ে 'সংসার' মেগা সিরিয়ালের ব্যানারে লট্‌কে দেবো।

—হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি যা বলো না। পুরো লোডশেডিং-এ হ্যারিকেন টিভি।

—ওসব হাসি মস্করা নয়। সিরিয়াস কথা, বাবার ওই তো 'সানসাইন এন্টারপ্রাইজ'-এ খাতা লেখার কাজ। ক'টা আর গান্ধীছাপা পাতা পায়?

—খবরদার বলো না মা। অ্যাকাউন্টেট কিন্তু মিয়োনো মুড়ির মতো ফাটবে।

—ঢং করিস না লীনা।

—এ আবার কী ঢং-এর শায়া, ব্লাউজ, গামছা ম্যালা? অ্যাঁ! কলের সামনে দড়ি খাটিয়ে...

—দ্যাখো, মিনুর মা। শুধু শুধু...

—কীসের শুধু, বিনতাদি, আমি জল নেবো, মাথায় তোমার শায়া ঠেকিয়ে...

—ঠিকই তো। তুমি এখানে কেন মেলেছো?

—আমি তো, কলের কাছে রাখিনি। কঞ্চিটা হেলে গেছে।

—তোমার ওই গতরে কঞ্চি কী আর শানায়...

—দ্যাখো সীমা, ফিগার নিয়ে কোনো কথা হবে না। একটাও বাজে কথা বলবে না।

—ওঃ! আমরা সব বাজে উনি কেবল...

—তোমার কেবল টিভির তার আমার কুমড়ো মাচার ওপর দিয়ে গেছে, আমি কিছু বলেছি?

—ওসব জানি না। এখানে মেলা যাবে না।

—কেন যাবে না? রোদ্দুর নেই...

—আমরা কী সব বোতলে রোদ্দুর ধরে রেখেছি?

—হাঃ, হাঃ। হিঃ, হিঃ, হিঃ ...

লীনার এই ঝগড়া, লোক দেখানো হাসি, একদম অসহ্য লাগে। মনে হয় কলোনীর মানুষগুলো কী বহুরূপী?

গৌরাঙ্গ কলোনীর ঝগড়ার ঝাঁঝাটা এক পশলা বৃষ্টিতে মিইয়ে যায়। ভ্যাপসা জীবন থেকে একটু সতেজ হাত লীনা শুধু গেঞ্জি পরে, এক চিলতে জানলার ফাঁকে বৃষ্টির জলে দূরের তরতাজা সবুজ ক্যানভাসটা খোঁজে।

—বিনতা শোনো, মাথা গরম করো না। চেঁচিয়ে কলোনি জানিয়ে কী হবে?

—মেয়েটা বড়ো হচ্ছে। একটু হাত-পা ছড়াবার জায়গা আছে? তুমি তো শুধু রাতের প্যাসেঞ্জার। এটা কী ওয়েটিং রুম?

—কী করা যাবে? কোথায় যাবো? ক'টা দিন চালিয়ে নাও। আর একটা ইনক্রিমেন্ট হলেই, ভেবে দেখবো।

—কী আমার ভাবের নাগর রে? ওই তো দেড়শো টাকার বাড়তি, তার জন্য আরও আধঘণ্টা বেশি পেন ঘসবে।

—তাহলে কী করতে বলো তুমি? দ্যাখো আমার সাফ কথা। একটু রান্না, শোওয়া বসার জন্য ভদ্দরলোকের মতো জায়গা চাই।

—তোমাদের অফিসে ওই এজেন্ট কমিশন না কী বলছিলে, টাকা এসেছে নগদে; যার নাকি পাকা হিসেব নেই।

—হ্যাঁ, সে তো তোমায় বলেছি। ও তো কোম্পানির টাকা।

—রাখো তোমার কোম্পানি। সে তো কেবল একটা সাইন বোর্ড। বাকি তো সব গ্রামের হবা-গবা-এর টাকা। ভাগ হবে তো?

—আরে না, না, ও থেকে ব্যাঙ্কেও জমা হয়।

—রাখো তোমার ব্যাঙ্ক। সেখানেও তো তোমাদের প্রাণকেষ্ট আছে। ওই যখন ঘোটালা হবে, তার ফাঁকে তুমি এক খাবলা মেরে দাও। তোমাদের কপালে 'নোট-ওয়াস' হয়ে যাবে।

—কী বলছো তুমি? সুনন্দ চমকে ওঠে। আট-বাই ছয়ের ঘুপচি ঘরটায় যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। অ্যাসবেসটস থেকে ঝোলানো ফ্যানের ব্লেডগুলো তাচ্ছিল্যের হাসিতেও চালাকির চমক দেখায়। কাটা ম্যাক্সির আব্রুতে জানলার বাইরে নোনা ধরা, কালচে সবুজ শ্যাওলায় ভরা দেওয়ালে সোঁদা, গুমোট গন্ধের ঝাঁঝ, মেঝের ইঁট বের করা ফাটলে মিশে যায়। অস্থির সুনন্দ স্বস্তির খোঁজে এক ফালি বারান্দায় প্লাস্টিকে ঘেরা রান্নার জায়গায় কালিঝুলি মাখা হাঁড়ি আর কড়ায় ঠাডা ভাত তরকারিতে বিনতার লক্ষ্মী-হাতের ছাপ পায় না। সামনের ফালি ইঁটপাতা রাস্তায় উপছে ওঠা নর্দমার পাঁক আর কালো জল কলতলার খোবলানো ভাঙা অংশ থেকে হাতছানি দিয়ে

ফিসফিসিয়ে বলে—আমরাও কালো, বাতিল। বহাল তবিয়তে আছি ভাই। চালিয়ে যাও। ঝাঁটা মেরে, ধাক্কা দিয়ে সরানো কী অত সহজ?

—কী গো? তুমি তো পুরুষমানুষ। একেবারে হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে স্ট্যাচু হয়ে গেলে।

—কী করতে বলো, তুমি? চুরি?

—আচ্ছা। জল, কলঘর, চান করা, কাপড় মেলা, বৃষ্টি, জলজমা, নর্দমার গন্ধ...

—অ্যাত দিন তো ছিলে। আজ হঠাৎ...

—আরে, দুপুরে শুভ্রর সঙ্গে দেখা। বলল—কী বৌদি? কেমন আছ? তার পর একথা সেকথার পর ও একটা ছোটবাড়ির হদিশ দিল,—ওই চৈতন্য পাড়ার দিকে। গাড়িতে বসিয়ে আমাকে দেখিয়ে এনেছে। এখন লাখ খানেক লাগবে। বাকিটা অল্প...

—তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?

—কেন বাবা? দ্যাখো না চেষ্টা করে। অফিস থেকে তুমি লোন পাবে না?

—বাজে বকিস না লীনা। সেবি-এর খোঁচায় কোম্পানি এখন ব্যবসা গুটোচ্ছে। লোন! বারের পুজোর প্রসাদের মতো মাসোহারা দিতে দিতে কোম্পানির এখন লাটে ওঠার যোগাড়।

—তুমি দ্যাখো না, সুমিতকাকুর সঙ্গে কথা বলে—

—ডেঁপোমি করসি না। পড়ায় মন দে। ঝুপ করে লোডশেডিং।

—এ্যাই হয়েছে এক স্টেট-এর কারেন্ট। রেললাইনের ওপারে সি.ই.এস.সি; দ্যাখো দিব্যি জ্বলছে।

—আলো জ্বালানোর দরকার নেই। তালাটা বাইরের দিক থেকে দিয়েছিস তো।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। সুনন্দদা সব ফিটিং। মোবাইলে টর্চের আলোয় অফিসের কমপিউটারটা চালায় প্রসূন;—গাড়িতে আসতে আসতে কী সলিড প্ল্যান ছকলে মাইরি।

—এ কী তোর ওই ক্লাচ-গিয়ার-ব্রেক-ইঞ্জিন অয়েল? এ হচ্ছে স্পেশাল গিয়ার-পাহাড়ে চড়তে লাগে।

—সত্যি মাইরি, এবার ড্রাইভারি ছেড়ে দিয়ে বৌয়ের নামে একটা ট্রান্সপোর্ট বিজনেস...

—সর্, সর্। সুনন্দ ফাইল চেক করতে করতে ছয়টা বাতিল এজেন্ট কোডকে মেন সার্ভার থেকে অ্যাক্টিভেট করে নেয়। আইডেনটিটি স্লিপ পাস হয়ে যায়। সিগনেচার প্রুফ কমপিউটার কেরামতিতে মেমারিতে লোড করে দেয়। ডিপোজিট ভাউচার সাবমিট করে। তিন লাখের কমিশন পেমেন্ট অ্যালাউ হয়। লক কোড প্রসূন লিখে নেয়। কমপিউটারের সব কাজের হদিশ ডিলিট করে দেয়, শাট ডাউনের আগে। অন্ধকারে আনন্দে দিশাহারা হয়ে কোড দেখে তালা খুলে, হাতড়ে বার করে নিজের নিজের ভাগবুঝে নিয়ে...কড়াং করে বাইরে একটা বাজ পড়ার শব্দ হয়। আলোর ঝলকানিতে কাচের ফাঁকে ফাঁকা অফিসটা একবার আলোয় ভরে যায়।

প্রসূন বৃষ্টি আসছে। চল্ কেটে পড়ি। দাঁড়ান দাদা, বন্ধ হয়েছে কী না দেখি।

সুনন্দ হাতের পাতলা গ্লাভস্ খুলতে খুলতে বলে—আরে! চল, চল। আমরা তো এখন এখানে নেই। লগবুকে মেদিনীপুর অফিসে অ্যাকাউন্ট চেক করার ডিউটিতে।

---রাতে আপনাদের এই নতুন অফিসে কোনও সিকিউরিটির ডিউটি থাকে না?

—দেখুন, আমাদের এই আই. টি. প্রজেক্টের প্ল্যানটা সবে লঞ্চ করেছে। এখন অ্যাকাউন্টের যাবতীয় ক্যাশ ও চেক লেনদেন এখান থেকেই সারভিলেন্স হয়।

—কখন এই তিন লাখের সর্টফলটা চোখে পড়ে?

—আজ সকালে মেন ফ্রেম কমপিউটার অন্ করতেই ডেবিট ও ক্রেডিট ব্যালান্স মেলে না। আর ছয়টা পেমেন্ট অথরিটির হদিশ পাওয়া যায়।

—আদিত্যবাবু কমপিউটার এক্সপার্ট-রা কিছুক্ষণের মধ্যেই রিপোর্ট দেবেন। ততক্ষণ আপনি আমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করুন। পুলিশি জেরায় কোম্পানির অ্যাসেট, এমপ্লয়ি ডিটেলস্, ব্যাঙ্কিং রিলেশান, ব্রাঞ্চ অফিসের হদিশ সবই নথিভুক্ত হয়।

—স্যার, স্ক্যান করে সবই পেয়েছি। হার্ড ডিস্কটায় বেশি লোড ছিল না। যেই করুক ডিলিট মেরে পালিয়েছিল। পুলিশের কাছে তিনলাখের ছক আঁকা হয়ে যায়।

—আদিত্যবাবু, এই কোডটা কার?

—পেয়েছেন? পেয়েছেন? এইটা আমাদের সিস্টেমে এবার নতুন ইনস্টল করা হয়েছে। মেন ফ্রেম কমপিউটারে অ্যাকসেস করলেই কোড আর টাইম মাস্ট।

—আপনি জানেন না?

—আমি এলিনাকে বলছি। ও এখন উল্টোডাঙার অফিসে।

—স্যার, সুনন্দ অধিকারী; রাত্রি দেড়টা।

—সে তো, এখন মেদিনীপুরে। ওখানকার অ্যাকাউন্টস্ চেকিং-এ ব্যস্ত।

—ট্রাঙ্কে কোন ফিংগার প্রিন্ট নেই, স্যার। কিন্তু লকের কোড ওটাতেই ব্যবহার হয়েছে।

—আচ্ছা, আমরা এখন আসছি। কমপিউটার, ট্যাঙ্ক আর রুমটা সিল করে দিচ্ছি। প্রয়োজনে ডাকলেই আসবেন।

আদিত্য ভেবে নেয়, সুনন্দকে সরাতে হবে। একে রাখলে পুলিশি ঝামেলা সামলাতে আরও নোট বেড়িয়ে যাবে। ভেতরের খবর বেশি নাড়াচাড়া না করে, আরও দু'শো এজেন্ট লাগিয়ে লসটা তুলে নেবো।

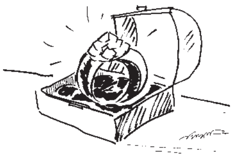

—আপনি এসেছিলেন কলকাতার সল্টলেক অফিসে?

—না, স্যার। আমি তো তখন মেদিনীপুরে।

—আপনার কোড...

—ওটা স্যার, কেউ হ্যাক করেছে...

—সেই হ্যাকার, অফিসের অ্যাত ইনফরমেশান দিয়ে...

—স্যার, অফিসেরই কেউ হবে। এখানে কী দু'নম্বরী চলে জানেন না?

—আপনি জানেন তো? তাহলেই হবে।

—না, মানে...

—হ্যাঁ। আপনি অ্যাকাউন্টস্-এর সর্বেসর্বা। তিন লাখ সম্পর্কে বলুন।

—স্যার, সত্যি বলছি। আমার বউয়ের দিব্যি। কিছুই জানি না।

—বাব্বা! আবার বউ কেন? থানায় চলুন। আপনার নামে এফ. আই. আর. আছে।

—আমি স্যার, নিরাপরাধ। আমাকে শুধু শুধু জড়াচ্ছেন।

সুনন্দ ভয়ে ভয়ে থাকে। বউ বলেছে বেফাঁস কিছু বলবে না। আদিত্যও হাসিমুখে বলেছে—ঘরে মেয়ে বউ আছে, ওদের দিকটা ভেবে দেখবেন। এটা কী শাসানি?

থানা, পুলিশ, তল্লাশী আর জেরায় জড়িয়ে গেল সুনন্দ অধিকারী। কলোনিতে জোর পি. এন. পি. সি.-এর গুলজার। টাকার হদিশ পেল না পুলিশ। জেলে সুনন্দ আটক। চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়। বড়বাবু প্লেন ড্রেসের পুলিশ মারফত বিনতাকে ডেকে পাঠায়।

—আপনি এখন স্বামীকে বাঁচাতে পারেন।

—আমি, ওর অফিসের খবর কী জানবো? কিন্তু এই চাপ থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারি। দুপুরের ফাঁকা বড়বাবুর ঘরে, ফ্যানের হাওয়ায় সায়ক চ্যাটার্জির সামনে বিনতা বুকের আঁচলটা সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে,

—কী বলছেন কী?

—খুব সোজা স্যার। বিনতা ঘুরে গিয়ে সায়কের পাশে দাঁড়ায়। ওই হাতে প্রমাণের অভাবে ওকে ছেড়ে দেবার কাগজে সই করবেন। আর এই হাতে—বলেই সায়কের হাতটা নিজের কোমরে ঠেকিয়ে চেপে ধরে।

সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে সুনন্দকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। গান্ধী ছাপা কাগজের ছোঁয়ায় বিনতা এখন শান্ত।

—আরে সুনন্দদা; একবার বাইরে এসো। আরে, এ তো লাল্টুর গলা, বিনতা কোনরকমে হাত মুছে বাইরে যায়।

—এই যে, বৌদি। একবার সন্ধেবেলা, দাদাকে নিয়ে এসো। আর সবাইকে বলেছি।

—দ্যাখো, কলোনির এই সামনের অংশটার অবস্থা খুবই খারাপ। এভাবে থাকা যায় না। আমরা মিউনিসিপ্যাসিটি, কোর্ট-কাছারি করে জমিটা কিনে নিয়েছি। অনেক শরিক, বিস্তর নোটের গল্প হয়েছে। মোদ্দা কথা হলো, এখানে একটা ফ্ল্যাট হবে। যারা থাকতে চায়, ফ্ল্যাট পাবে; আর যারা চাইবে না, তারা টাকা নেবে। আমি চাই সবাই এখানেই থাকুক।

—ফ্ল্যাট নিতে গেলে, আমাদের কী দিতে হবে?

—মুন্না তুই চেপে যা। একটা করে ছোট ফ্ল্যাট আর কিছু টাকা আমরা দেবো।

—টাকাটা কত?

—এখন দশ-বিশ কিছু একটা ধরো। সামনের ছ'টা ফ্যামিলি রোববারের মধ্যে ফাঁকা কোয়ার্টারে সিফ্ট করিয়ে দেবো, সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আর, পিছনে সুনন্দদার ঘরটা এখন থাক। খানিকটা কাজ এগোক,...তারপর...; কী, বৌদি ঠিক আছে তো? লাল্টুর প্রমোটারি দাপটে পুরোনো বাড়ি, ফাঁকা জমি-এলাকায় সব সিঁটিয়ে থাকে। তার মুখোমুখি, কথাই সরে না বিনতার। শুধু ঘাড় নাড়ে। মনে মনে ভাবে এই কলোনির জীবন থেকে মুক্তি চাই। কী ঘিঞ্জি, নোংরা পরিবেশ? মাথা গোঁজার ঠাঁই না শুয়োরের খোঁয়ার?

সুনন্দ একটা হোল সেলারের ওখানে হিসাব দেখার কাজ করে। সকালে বেড়োয়, রাত্রে ফেরে। লীনার সকালে পড়া, দুপুরে স্কুল, আবার বিকেলে গান শেখা বা টিউশনি করা। বিনতা শুধু একা। বাঁশ-কাঠ-লোহা-সিমেন্ট- বালি-ইঁট-হইচই-এর মাঝে লাল্টু এসে হাজির। বিনতা চমকে ওঠে। কী বৌদি? কাজে ডিসটার্ব করলাম? একটু জল দেবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো না। ভেতরে এসো।

লাল্টু জুতো খোলে। ভেতরে ঢোকে। জল খায়। বিনতা বলে—আমাদেরটা এখন দেরি হবে, না? আচ্ছা, দু'কামরার পাওয়া যাবে?

—সবই হবে। দামের একটা ফারাক তো থাকবেই।

KSL
KIRTI SOLAR LIMITED

Electric Rickshaw – KS-2

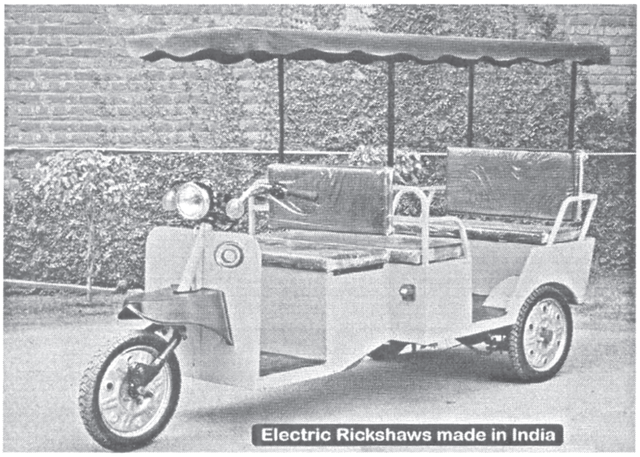

Model - KS-2

Technical Specification	
Motor Type	1000w BLDC
Length:	110 Inch
Width:	41.5 Inch
Height	67 Inch
Max Speed	20 -25 Km/ph
Break Type	Rear Drum
Ground Clearance	6 Inch
No of Passengers	4 -6 Persons
Battery Quantity	4 Pcs
Tyre Size	3.00 - 14

Description Details

The eye-catching NEW Electric Rickshaw by **Kirti Solar** is built for comfort on the roads of India. Powered exclusively by electric power, this eco-friendly vehicle is a great source of revenue as well as a cost effective solution to the environment's problems.

Designed keeping in mind the Indian conditions and guidelines, this electric rickshaw can comfortably accommodate one driver and 4-6 passengers. Built to withstand any kind of road conditions, and sturdy to last long, we have made the perfect public vehicle for the road.

Note:

- *Prices are based on bulk purchase reserved with advance payment and are extended to dealers exclusively.*
- *The warranty on the unit is 6 months towards any manufacturing defects.*
- *Transportation cost extra.*

Kirti Solar Limited

Corporate Office: 56D, Mirza Ghalib Street, 2nd Floor, Kolkata - 700016 | **Registered Office:** 10A, Middleton Row, 2nd Floor, Kolkata - 700071
P: +91 33 40646077/78/79 | F: +91 33 4064 6080 | E: info@kirtisolar.com | W: www.kirtisolar.com

দ্যাখো, আমি চাই— তোমরা এখানেই থাক। ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকাটা একটু বুঝে সুখে দেবো। কারণ আমাদেরও লাভটা দেখতে হবে তো...

—আর লাভ? দেখলে তো সবই। ওই শালা আদিত্য দাদাকে ফাঁসিয়ে, কেমন তাড়াল। কিচ্ছু দিল না। মেয়েটা রয়েছে, মানুষ করতে হবে। ওই তো এখন দোকানে খাতা লেখার কাজ। ক'টা টাকা আর পায়?...

—পাবে, পাবে। তুমি পাবে। একটু দেখেনি...

বিনতার পিঠে একটা আলতো চাপড় মেরে লাল্টু ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলে—আজ, একটু কাজ আছে। পাথর আর বালি আনলোডিং, নতুন লেবার সাইটে আসবে।

মাস খানেক পরে, সন্ধেবেলা লাল্টু সুনন্দ, লীনা আর বিনতাকে ইঁট- কংক্রিটের থামের মাঝে ডাকে। একটা ইঁটের সীমানা দেখিয়ে বলে,

—সুনন্দদা, এই পার্টটা আমি রেখেছি; তোমাদের জন্য। বৌদি অনেক করে বলেছিল। কিন্তু তোমরা সকলকে বলবে, বাড়তি অংশ কিনেছো। বিনতা চমকে ওঠে, মাটির তলায় পোঁতা কাগজগুলোর কথা ভেবে। বলে,

—টাকা কোথায়? এই তো অবস্থা; সবই তো তুমি জানো।

—সব আমি জানি না। শুধু বলবে ফ্ল্যাট মর্টগেজ রেখে ব্যাঙ্ক থেকে লোন করেছ। বাকিটা, আমি সামলে নেবো।

লীনা খুশিতে বলে—বাঃ! কত জায়গা। বেশ হবে।

সুনন্দ হতাশভাবে বলে—লাল্টু আবার কিছু গণ্ডগোল হবে না তো? লাল্টু বিনতার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করে বলে—আরে গণ্ডগোল-শোরগোল—এসব গোল নিয়েই ঝামেলা। আসল গোল-এ কোনও ঝামেলাই নেই, হেসে বলে। যা হোক তুমি লীনাকে নিয়ে এগোও। আমি বৌদিকে কয়েকটা পেপার সাইন করিয়েই আসছি। ফ্ল্যাট বৌদির নামে হবে তো?

সুনন্দ তাড়াতাড়ি বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। যা ভালো বোঝো করো। ওরা চলে যায়। লাল্টু বিনতাকে নিয়ে সিঁড়ির পাশে একটা ঘেরা জায়গায় যায়। পাশে একটু দূরে আলো আছে।

—বলো, কী করতে হবে?

—কী আর করবে? পেপারে সাইন...

—আরে? পেন নেই তো!

—এ সই করতে হলে পেন লাগে না। শুধু সুদটা গুণে নিতে হয়।

বয়সের ভারে লাল্টুর ভালোবাসায় পিছলে যায় বিনতা। বহুদিনের আকর্ষিত জমিতে আবার দেখা যায়, সবুজ কচিপাতার উন্মেষ। সুনন্দ খুশি হয়। কিন্তু নতুন দায়িত্ব সামাল দিতে চিন্তিত। লীনার গায়ের রঙ কালো আর দেখতে একদম সাধারণ। আর নতুন অতিথি জিজা খুবই ফর্সা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। সময়ের তালে ফ্ল্যাটে নতুন সংসার গুছিয়ে নেয় বিনতা। জিজা তখন স্কুলে আর লীনা কলেজের গণ্ডিতে। প্রায় দুপুরে আসে লাল্টু, বিকেল পর্যন্ত থাকে। কখনও মদ খায়। বিনতার সঙ্গে ভালোবাসার দাবার ছকে চাল দেয়। বিনতা তখন লাল্টুর হাতের ঘুঁটি। হঠাৎ দুপুরে কলিং বেল। বিনতা দরজা খোলে। দৌড়ে ঢোকে জিজা। লাল্টু দেখে অবাক।

—আরে! কত বড় হয়ে গেছে বুড়ি! আয়, আয়।

জিজা ভয়ে ভয়ে কাছে আসে। লাল্টু একদম জড়িয়ে ধরে আদর করে। বিনতার চোখে লাল্টুর হাতের ছোঁয়া ভালো লাগে না।

—ওকে, ছেড়ে দাও, লাল্টু। লাল্টু জিজাকে ছাড়ে কিন্তু হাতটা ধরে রেখে বলে—একদিন বেশ জমিয়ে আলাপ হবে।

জিজা ছুটে পাশের ঘরে চলে যায়। আসছি বলে লাল্টু বেরিয়ে যায়।

বেশ কয়েকদিন পর নোনাপুকুর এলাকায় লাল্টুর অফিসে বিনতা আসে।

—তুমি জিজাকে প্রায়ই স্কুল আনা নেওয়া করছ। কী ব্যাপার...

—ব্যাপার, আবার কী? আমি ওদিকেই যাই, মাঝে মাঝে; তাই...

—না, না। এটা করার কোনও দরকার নেই। তুমি তো আমাদের জন্য অনেক করেছ...

—আরে করতে পারলাম কই? হেসে ওঠে লাল্টু, যা হোক ওসব ফ্যাচাং ছাড়। জিজাকে কবে ফচকাবো বলো।

—কী? তুমি ভেবে দেখেছ, কী বলছ?

—সব ভাবা আছে। জিজাকে আমার চাই। নাহলে রোববারের মধ্যে ফ্ল্যাট খালি করে দেবে।

—কী মগের মুল্লুক না কী?

—আস্তে বলো। এটা আমার অফিস।

—ওসব অফিস দেখিয়ে নো। উকিল-কোর্ট কিছুই কী নেই?

—ওসব আছে, ম্যাডাম। শুধু, চোতা কাগজটা আছে? ডিড-এগ্রিমেন্ট- সার্টিফিকেট-ট্যাক্স-রেজিস্ট্রেশান...

বিনতা ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ে। ঘামতে থাকে। এ. সি.-এর ঠাণ্ডায় দম বন্ধ হয়ে যায়। কোনও কাগজই তো লাল্টুর কাছ থেকে প্রেমের মোহে চাওয়া হয়নি।

—লাল্টু তুমি আমার এ সর্বনাশ করো না। আমাকে যা বলবে, করব। আমার জিজাকে ছেড়ে দাও। ও ছোট্ট মেয়ে...

—আরে, ওর জন্যই তো সব। নথ ভাঙানি দেবো না নগদ পাঁচশো হাজার।

বিনতা চিৎকার করে ওঠে—চাই না আমার টাকা, শালা...বাকি কথা চাপা পড়ে যায় লাল্টুর এক সপাটে থাপ্পড়ে। ঘুরে পড়ে যায় বিনতা। লাল্টু কাছে এসে চুলের মুঠি ধরে তুলে, আস্তে আস্তে বলে—যাঃ রাস্তায় ঘুরে বেড়া। দ্যাখ্, কত ধানে কত চাল। ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়।

মল্লিক বাগানে একটা ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে সুনন্দ অধিকারী আবার সংসার গোছায়। একটা পুরোনো সাইকেল কিনেছে। দাঁও মারা টাকাটা অল্প অল্প করে ব্যাঙ্ক আর পোস্ট অফিসে জমা দেয়—বিনতা আর মেয়েদের নামে। বিনতা একটা সেলাই-এর স্কুলে দুপুরে যায়। বোনা, সেলাই থেকে কিছু রোজগার হয়। আরব, দুবাই, কুয়েত, কাতার প্রভৃতি জায়গায় যে পাইকারি রুমাল, ওড়নার অর্ডার আসে; সেই দলে ভিড়ে যায়।

—আবার এই ভরদুপুরে বই হাতে? কী ব্যাপার রে, তোর? কোনও খবর নেই।

—আপনি ভালো আছেন মাসিমা। আমার আবার কী খবর থাকবে?

—তোরা এখন অনেকটা দূরে চলে গেছিস না?

—কত করে বললাম, একদিন যেতে। গেলেনই না। সৌরক বাড়িতে আছে?

—হ্যাঁ রে, আছে। যা ওপরে গিয়ে দ্যাখ।

—এই মেয়েটা যে কেন খোকার পেছনে পেছনে ঘোরে, কে জানে? শুনেছি বাবা-মা দুজনেই ভালো নয়। কী সব গণ্ডগোল? খোকাকে না আবার ফাঁসিয়ে দেয়, যা দিনকাল পড়েছে—ভাবতে ভাবতে কাগজে চোখ রাখেন সৌরকের মা।

সৌরকদের দোতলা বাড়ি। বাবা নেই, কোথায় যেন নিরুদ্দেশ। কোনও খবরই পাওয়া যায়নি। মা একা। ফ্যামিলি পেনসন পান। আর কিছু ফিক্সড্ ডিপোজিটের সুদ। এসব নিয়েই সংসার। ছিমছাম সাজানো গোছানো সব ঘর। সৌরকের মা খুব পরিষ্কার, ফিটফাট থাকেন। সৌরকের মাঝারি গড়ন, পেটানো চেহারা। ভালো ব্যাডমিন্টন খেলে। আঁকার হাত দারুণ। আবৃত্তি করে ভালো। স্কুল, কলেজ আর স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় ওর লেখা ছোটগল্প, কবিতা প্রায় ছাপা হয়। সাহিত্য সভায় বেশ জমিয়ে বক্তৃতা করতে পারে।

—আরে, বাঃ! এস. ডি. জি.-এর নোটটা নিয়ে তুই চেপে গেলি। লাইব্রেরি থেকে এরিকমনের বইটা তুললি, আমাকে জানালি না। ফোনও করলিনা—এক নাগাড়ে বকে ধপ্ করে বসে লীনা।

—কেন রে, দুম্বা; জেরক্সের দোকান থেকে পি. এন. বি-এর পুরো নোটটা তুই পেয়ে গেছিস। দত্ত-রায়ের বইটা এমিলির থেকে চেয়ে লিখেছিস্,

—আমাকে এস. এম. এস. করেছিলি?

—একদম সময় পাইনি। জানিস তো কীরকম ঝামেলা।

—আমারও সময় হয়নি, বলেই সৌরক মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

—না প্লিজ। তুই মুখ ঘোরাস না।

লীনা চটপট ঘাঁটতে থাকে বইপত্র, নোটস্, কোশ্চেন। সৌরক স্যান্ডুয়িচ আর সরবত আনে। লীনা গোগ্রাসে খেয়ে নেয়। খেতে খেতেই বলে—তাহলে আজ আমি কী খালি হাতেই ফিরব?

—কেন সঞ্জয়ের আর নন্দুর কাছ থেকে তো আপাতত বইদুটো হাতিয়েছো। ও-দুটো হজম করো। তারপর এসো।

কলেজ সার্কেলে লীনার 'বাজারি' নামের পরিচয়ে সৌরকের মনটা দমে যায়,—সম্পর্ক তাহলে কী শুধু পরীক্ষায় পাশ আর ডিগ্রির চোতা কাগজ পাওয়া। কলেজে পড়াশোনা আর আড্ডার ভিড়ে আস্তে আস্তে লীনার অবয়বটা ঝাপসা হয়ে যায় সৌরকের কাছে। একদিন কলেজ ল্যাবরেটরিতে প্র্যাকটিকাল চলছে। সৌরক, সায়ন, সুশান্ত আর অমিত এক জায়গায়। ম্যাটিনিতে সিনেমার তাড়ায় হুড়োহুড়ি চলছে। বড়ো জার থেকে অ্যাসিড নিতে গিয়ে একটি খুব সুন্দরী ফর্সা মেয়ের ধাক্কায় আচমকা সৌরকের হাতে অ্যাসিড পড়ে যায়।

—আঃ জ্বলে গেল রে! কী জ্বলছে! ব্যস এইটুকু। সিনেমা দেখা মাথায় উঠল। স্যারের বকুনি। ফাস্ট এড। ব্যান্ডেজ, কোনওরকমে ক্লাস শেষ করে। ছুটির পর একটা কদমগাছের তলায় বাঁধানো চাতালে সবাই বসে।

সুশান্ত বলে—কী টক্কর, মাইরি...

অমিত হেসে ওঠে—ফাস্ট শোয়েই একেবারে অ্যাসিড ওয়াশ। সায়ন আস্তে আস্তে বলে—শালা, ওর ফাটছে আর তোরা মাইরি লগ-অন করেই যাচ্ছিস।

সৌরক মাথা তুলে বলে—ওই আসছে, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট নিয়ে। কনফার্ম করব না। 'স্পাসর্ন' বলে মার্ক করব।

সুশান্ত বলে—আর কেলিয়ো না। আপাতত রি-চার্জ করে নাও, পরে নেটওয়ার্ক চেকিং হবে।

মেয়েটি আসে হাসিমুখে। সৌরককে বলে—আমি শীলা; ভেরি সরি। একদম বুঝতে পারিনি।

সৌরক কাটানোর জন্য বলে—না, না। অ্যাকসিডেন্ট বুঝে হয় না। হওয়ার পর বোঝা যায়। হেসে ওঠে।

—প্লিজ, যদি কিছু হেল্প লাগে।

—আরে না, না। ফাস্ট এড হয়েছে। ওসব ঠিক হয়ে যাবে। থ্যাঙ্কস্। টা, টা।

—টা, টা, বলেই শীলা সৌরককে একটু দেখেই চলে যায়। অমিত হেসে বলে---তুই শালা, একদম ঘেঁটে

বাঁশ...সৌরকও হেসে বলে—শালা বাঁশ কী আখ, সে তুই বুঝলি না। রসের খবর প্রজাপতিই রাখে, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

পরের দিন সৌরক শীলাকে দেখতে পায়। ফর্সা, স্লিম, সুঠাম চেহারা, পানের মতো সুন্দর মুখ। প্যান্ট, শালোয়ার, ফ্রক বেঢপ-বেমানান-এর ভিড়ের মাঝে খুব সযতনে সাজানো শাড়িতে একটা মোহময়ী সৌন্দর্য যেন কাছে ডাকে। ক্লাসে একটু চোখাচোখি হয়। একটু অস্ফুট হাসি। মাথা নাড়া চলে।

ক্লাস শেষ হলে শীলা বলে—ক্যান্টিনে গেলে কেমন হয়?

সৌরক সঙ্গে সঙ্গে বলে—আমার সঙ্গে টিফিন আছে, শেয়ার করতে পারেন।

—আমারও সঙ্গে আছে। এই ভাবছিলাম, একটু টাইম পাস।

—তাহলে একটু বসা যাক।

আড্ডার পরতে পরতে গল্পের ছোঁয়ায় সৌরক আর শীলা ভালো বন্ধু হয়ে যায়। কোনো আইসক্রীম বা চিপস্-এর মাঝে সৌরক কখনই শীলাকে শুধু একটা কথা—'ভালোবাসি'- জানাবার ফুরসত পায় না। শীলা বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে।

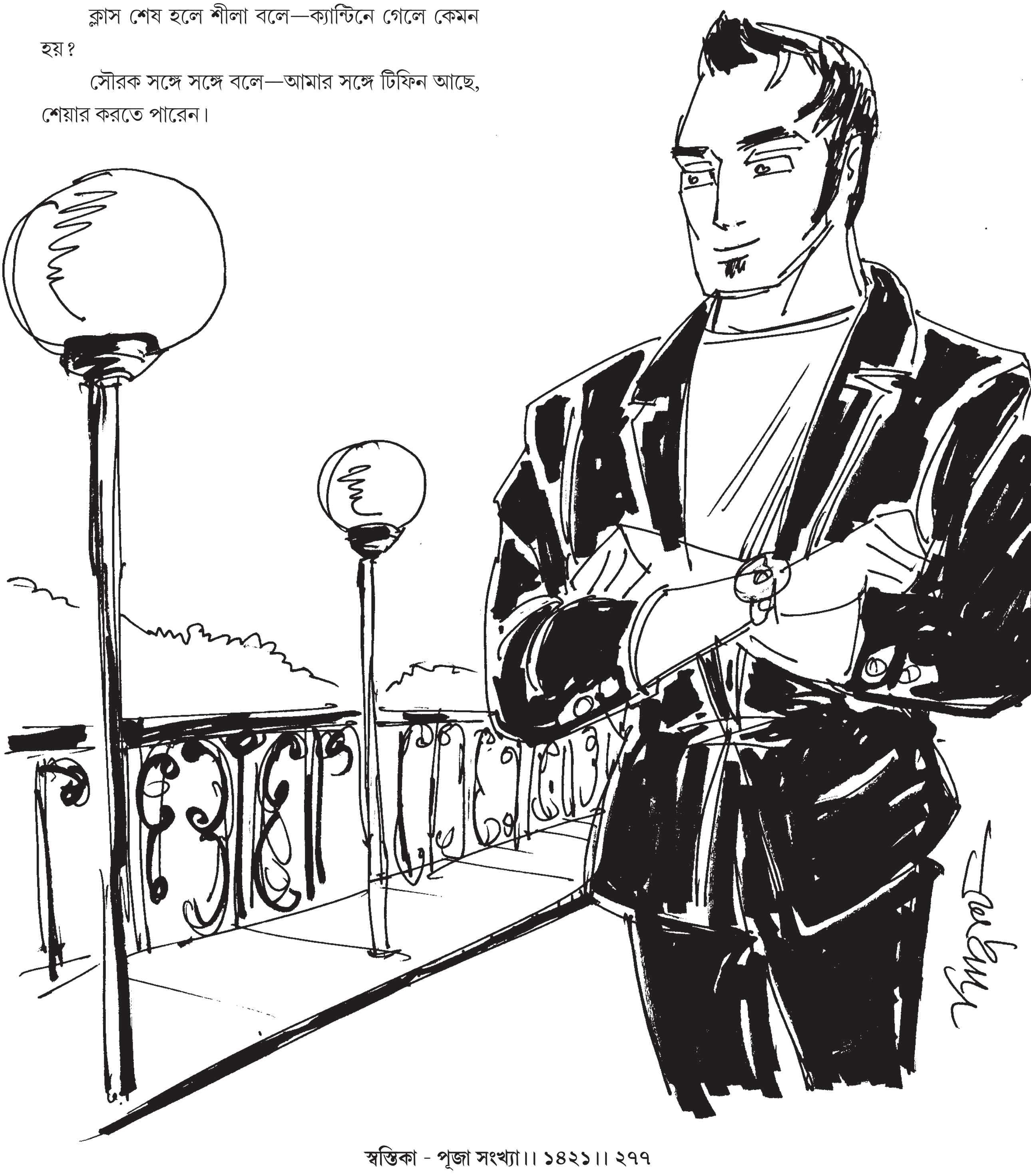

TODI HONDA 225C, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700 020
Contact Info: 9831447735 / 9007035185, e-mail : todihonda@gmail.com

বাবা-মা দুজনেই সার্ভিস করেন। শীলা একা একেবারে হাঁফিয়ে ওঠে। এই 'শান্তিনগর অ্যাডভান্সড্ স্টাডি কলেজ'-এ ভর্তি হয়েছে শুধু পরিবেশ আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির টানে। কানপুরে থাকার সময় ক্যাম্পাসে যেন নিজেকে খুঁজে পাওয়া যেত না। এখানে পাশেই গঙ্গার মাঝে অলস মাঝির নৌকা টানা ও পাড়ে ছলাৎ শুধুই ঢেউয়ের মূর্চ্ছনা। মোটা মোটা থামের মতো পাম গাছের সারি দিয়ে ঘেরা বিশাল মাঠ। কলেজ বিল্ডিং-এ ঢোকার মুখেই বিশাল চওড়া সিঁড়ির ধাপ। নানা ফ্যাকাল্টিতে যাওয়ার রাস্তার দু'পাশে ক্রোটোন, রঙ্গন, করবী, অ্যালামুন্ডা আর সুমান্ডা, থুজা কমপ্যাক্ট আর ল্যাবরেটরি, যে দেখে বোঝাই যায় না, কলেজটা এই এলাকার একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক।

শীলা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে,—নোটস্, সাজেশেন, সৌরকের সঙ্গ, সব বাবল্‌সের মতো কয়েকদিন হারিয়ে যায়। শীলাকে আর কলেজে দেখতে পায় না সৌরক। রেজাল্ট বেরোয়। শুরু হয় চাকরির চেষ্টা। হঠাৎ একদিন শীলাকে মাঝের বাজার বাসস্ট্যান্ডে দেখতে পায়।

—কী হল? কী খবর?

—তোমার আপডেট কী?

—এই এদিকে একটা ইন্টারভিউ-এ এসেছিলাম।

—আমি সিক্সটি-টু পারসেন্ট করেছি। এদিকে একটা বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম। অনেকদিন যায়নি। প্রথমে একটু ঝগড়া করলাম। তারপর ভাব হল। এখন কখন বাস, অটো কী পাবো, কে জানে? এদিকে তো বড়ো একটা আসা হয় না। বাপী, মাম্মী থাকলে তো গাড়িতেই। দুটো গাড়িই সার্ভিস সেন্টার-এ।

—আরে থামো। বলেই যাচ্ছ। আমি সিক্সটি-সেভেন পারসেন্ট।

—দ্যাটস্ কোয়াইট গুড। রিসার্চে জয়েন করছ তো?

—না-ন্-না। একটা জব খুব প্রয়োজন।

—দিস ওয়ে, দ্য ট্যালেন্ট ডাইস্। ইউ হ্যাভ গট অ্যা ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট। ইউটিলাইজ ইট ফর দ্য বেনেফিট অফ সায়েন্স।

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে বকবে না, কোথায় যাবে?

—হ্যাঁ গেলেই হয়। একটা ফাঁকা অটো আসছিল। সৌরক থামায়।

—দাদা কতদূর? আমি স্বরূপনগর যাব। ওখানেই বাড়ি। খেতে হবে।

—আরে, চলুন চলুন, শীলা তোমার কোনও আপত্তি?

—আরে, না, না। চলো বাড়ি যাই।

অটোয় যেতে যেতে গোঁ গোঁ আওয়াজ আর ভাঙা রাস্তার গুঁতোতে দুজনের ওলোট-পালট অবস্থা। সৌরক শুধু শব্দটা বলার কত রিহার্সাল দিয়েছে। কিন্তু এখন শীলার পাশে বসে মার্কেটিং করা, গোছানো, লিস্ট মেলানো, স্টিকার, লেবেল, জামাকাপড়ের বকবকানির মাঝে, হাঁ, হুঁ, ঠিকই তো, ঠেকায় বাড়ি এসে পৌঁছোয়। নেমে শীলাই ভাড়া মিটিয়ে দেয়। বিশাল বাড়ির লোহার গেট খুলে দেয় দরোয়ান। বসার ঘরে সোফার গা এলিয়ে দেয় সৌরক।

—কী হল? একদম চুপচাপ?

—না। এই গোছগাছ; কী কারণ—

—ওঃ! ওহো, বলাই হয়নি। কাল আমি ফারদার স্টাডি ও রিসার্চ-বেস্‌ড জবের জন্য মামার কাছে কানাডায় চলে যাচ্ছি।

—সে কী? এখানে!

—না। আর দেখা হবে না। তাই একটু আড্ডা মারতে বাড়িতে তোমাকে নিয়ে এলাম। এই ক'টা দিন বেশ হুল্লোড়ে কেটে গেল। আর তুমি খুব ভালো লিস্‌নার। মন দিয়ে সবাইকে সময় দাও।

আরও কত কী বলছিল শীলা। সৌরক দেখল শীলা বন্ধু হয়েও এই একাকীত্বে দূরত্বটা ঠিক বজায় রেখেছে। বেরোবার সময় বলে—চলো, তোমাকে একটু সামনের পথে এগিয়ে দি।

হালকা আলো-ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে দু'পাশের উঁচু গাছপালার ফাঁকে রাস্তায় ওরা এগিয়ে যায়। সৌরকের মনের সেই শব্দটা একটা ভিড় বাসের পাদানিতে উঠতে গিয়ে অব্যক্তই থেকে যায়।

'আবহমান' পত্রিকার কাজ মিটিয়ে সন্ধেয় বাড়ি ফিরতেই সৌরক দেখে পঞ্চানন মিত্রের বাড়ির সামনে বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে। খবরাখবর আসে সেরিব্রাল স্ট্রোকে অফিসেই পঞ্চাননবাবু মার গেছেন। বডি আসছে। পাড়ার ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে একটু যেতেই হয়। সৌরক পায়ে পায়ে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। জানলার পর্দা টানা। ওর মতো আরও দু'চারজন হিতাকাঙ্ক্ষী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গজালি মারছে। তখন সন্ধে সাতটা। বডি এল। অফিসের স্টাফরা মাথা নীচু করে বাড়িতে ঢুকল। দুই মেয়ে কেঁদে উঠল। নিরীহ একজন সজ্জন মানুষের মৃত্যুতে পাড়া প্রতিবেশীর চোখে জল। বড় জামাই টাক চুল্‌কে কেবল ছক কষে চলে, শ্রীহরিপুরের এই বাড়ি বিক্রি করে কীভাবে শাশুড়িকে একবার গড়িয়ায় নিয়ে ফেলা যায়; তাহলে মেয়েকে দেখার আয়ার খরচটা বাঁচবে, মা আর বড় মেয়ের অংশটা ফিক্সড করতে পারলে; মেয়ের বিয়ের জন্য চিন্তা করতে হবে না। এইসব যত মড়া নিয়ে হুজ্জোতি। অফিসের লোক আছে। ওদেরই গাড়িতে নিয়ে, ঘাড় মটকে ঘাটকাজটা সেরে ফেলা যাবে। বাইরে বেরিয়ে শুভাশিস বলে—আপনারা সবাই আসুন। সকলে আছে। ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

বারান্দায় পড়ে থাকে পঞ্চাননবাবুর দশাসই চেহারা। গলায় একটা সস্তা, লোক দেখানো রজনীগন্ধার মালা। কাকলি মাসীমা বাইরে এসে, কোনও দুঃখের উচ্ছ্বাসে কান্নার আবেগ দেখালেন না, সোজা অফিসের ক্লান্ত, দুঃখিত লোকগুলোকে জেরা করে—আচ্ছা, ওর সব জিনিসপত্র আছে তো? হাতে ঘড়ি, আংটি ছিল, পকেটে বেশ কিছু টাকা থাকত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সবই ওই সিলড্ প্যাকেটে রাখা আছে। স্ট্যাম্প দিয়ে লেখা আছে। ডেথ সার্টিফিকেট উইথ ফটোকপিও ওর মধ্যে। আমরা তাহলে আসছি। শুভাশিস ছুটে আসে—সেকী? আপনারা থাকবেন না; মানে সব ব্যবস্থা তো...

—না, না। আমরা ওর কলিগ। এইটুকু দায়িত্ব আমাদের ছিল। সব বুঝিয়ে দিয়েছি। এবার আমরা আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে অফিসের লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পাড়ার লোক কেউ নেই। মড়া পড়ে বারান্দায়। খবর দেওয়া—কী হবে—কে যাবে? এসব নিয়ে চলে কূটকচালি।

সৌরক পঞ্চাননবাবুর ছোট মেয়ে অমিতার টানে বার দুয়েক ঘুরে এসেছে। অমিতার গায়ের রঙ চাপা, মুখ গোল, বেশ আঁটোসাটো চেহারা। ঘরোয়া ছাঁচের মেয়ে। রাস্তায়, বাজারে সৌরকের সঙ্গে প্রায় দেখা হয়। একটু হাসি, কখনও দু-চার কথা। অমিতাও জানে, মা সারাদিন একা থাকে। হঠাৎ কোন প্রয়োজন সৌরকের উপর ভরসা করা যায়। তাই একটু টাচ রাখা। আর সৌরক ভাবে---অনেক হয়েছে প্রেম, ভালোবাসা। শালা, সব কাজ গুছিয়ে নেওয়ার মাল। এবার একেবারে শাঁখা-পলা দিয়ে, লোয়ার বার্থে শুইয়ে হানিমুনে নিয়ে যাব।

সৌরকদা একটু যাবেন? কেউ তো নেই। বাবার সৎকার কীভাবে হবে? কান্নায় ভেঙে পড়ে। গেটে অমিতা একা। তখন রাত্রি এগারোটা।

—ঠিক আছে। তুমি যাও। আমি দেখছি।

সৌরক জামা প্যান্ট পড়ে টাকাপয়সা, ম্যানিব্যাগ, ঘড়ি নিয়ে বেরোয়। পঞ্চাননবাবুর বাড়ির সামনে ফাঁকা। ঘরে চার-পাঁচজন লোক আর কয়েকটি মেয়ে ও মহিলা। সৌরক নবদাকে ঘুম থেকে তোলে। সে ওঠেই শুরু করে—সৌরক, তুমি এসেছো, তাই বেড়োচ্ছি। শালা, জামাইয়ের কী তোড় গো?

পনেরো মিনিটের মধ্যে নবদা ফুল টিক নিয়ে হাজির। সৌরক অমিতাকে কিছু টাকার কথা বলে। সাইকেলে লোক চলে যায়। সাজিয়ে বডি শ্মশানে পৌঁছোয় রাত সাড়ে বারোটায়। অমিতা ঘাটের একপাশে বলে—সৌরকদা যা যা করার করবেন। টাকা লাগলে বলবেন।

—কিছু চিন্তা নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। নবদা ঘাটের কেলোকে ডেকে সব ব্যবস্থা করে ফেলে। সব ক্রিয়াকলাপ শুরু হওয়ার মুখেই, আবার শুভাশিস আসে—একটা লাল পেড়ে শাড়ি ব্যবস্থা করুন। অমিতা মুখাগ্নি করবে।

নবদা বলে—সব তো আনা হয়ে গেছে। কী অসুবিধা হল?

—না, পঞ্চাননবাবুর তো ছেলে নেই। তাই অমিতাই মুখাগ্নি করবে।

—কেন? ওনার ভাইপো অর্ক এসেছে তো?

—একটু অসুবিধা আছে। ফিসফিস করে বলে—মুখাগ্নি করলে সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে যায় তো, তাই হবে না।

আবার কথা কাটাকাটি, তর্কাতর্কি। ঝামেলা বাড়ার আগেই সৌরক ছেলে পাঠিয়ে লালপাড় শাড়ি কিনে নেয়।

চিতায় তোলা হল পঞ্চাননবাবুকে। নবদা, সৌরক-এর তত্ত্বাবধানে সব সাজানো হল। প্যাঁকাটি জ্বালিয়ে অমিতার হাতে দেওয়া হল। দুবার মুখে কোনওরকম ছুঁইয়েই সৌরকের হাতে দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। নবদা আর সৌরক মিলে অমিতাকে শবযাত্রীদের ঘরে আনে। একটু মুখে, চোখে জল আর হাওয়ার শুশ্রূষায় ঠিক হয়। সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নবদা, সৌরক আর দু-চারজন ছেলের তদারকিতে পঞ্চাননবাবু পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন। ছেলেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিড়ি, সিগারেট, মদে মশগুল। শেষ কাজ মেটাতে গিয়ে দেখা যায় ঘরের মধ্যে সব মানুষই কেটে পড়েছে। অমিতা আর দুটো ছেলে বসে। নবদা ডেকে নিয়ে আসে। চিতায় জল দেওয়া হয়। গঙ্গা মাটিতে নাভি রেখে গঙ্গার জলে ভাসানো হয়। তারপর হরিধ্বনিতে কলসী করে গঙ্গাজল এনে ঢালা হয়। সবশেষে অমিতাকে দিয়ে কলসী ভেঙে, সবাই শ্মশান ছেড়ে বেড়িয়ে আসে। শ্মশানবন্ধুরা সবাই অবাক। একটু চা আর মিষ্টির ব্যবস্থাও নেই। নবদা আর সৌরক সবাইকে বুঝিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করে। আসছি বলে; সৌরককে হাত নেড়ে, বাইকে চেপে অমিতা ধাঁ করে চলে যায়। রাস্তায় তখন ভালোই বৃষ্টি পড়ছে।

নবদা বলে—দারুণ হয়েছে মাইরি। লাশ পার্টির কেউই নেই। আমরা কতগুলো অভাগা গঙ্গায় নেয়ে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে ফিরছি।

তরুদা বলে—দারুণ পার্টি মাইরি, মক্ষীচুষ। এক কাপ চা অফার করল না।

নিবারণ বলে—আমাদের বলতে পারত, শালা চা-মাল সব ব্যবস্থাই পাকা থাকত।

বাইকে যেতে যেতে অমিতা মনে মনে ভাবে—যাক সৌরককে নেড়ে, বেশ কাজটা গুছিয়েই হল। ফালতু খরচও হলো না, খাটনিও বাঁচল। আঃ! যদি জ্ঞানটা থাকত, কোলে

চাপার মজাটাই ফসকে গেল। যাক, একটা 'যাদু-কা-ঝাপ্পি' দিয়ে কাজটা বাগিয়ে নিতে পেরেছি।

হারুদা বলে—এতো শালা হাওড়ার কেস। কাগজপত্রে উতরে গেল। একবার শালা, আমাদের পাড়ার কানাই সিনহারে, ওর বন্ধু সুমনের বাবা মারা গেছে। দু'বেলা শালা, কাকা-কাকা করত। শালা, ডেথ সার্টিফিকেট নিতে গেছি, বলে কীনা টাকা দে।

আমি বললাম—সে কী, তোর বন্ধুরা বাবা রে; তুই পয়সা নিবি? বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চেম্বারে বসলে টাকা লাগবে। এখানে কাকা, জ্যাঠা চলে না।

—শালা, ছিল মাছের আড়তের জলে ভেজা নোট। ছুঁড়ে দিয়ে এসেছিলাম। নবদা বলে—কেন, মল্লিকার মায়ের কেসটা? মেয়ের বিয়ের পরের দিন মরল। শালা, কোনও ডাক্তার সার্টিফিকেট দেয় না। বলে—গাড়িতে মরেছে,—হাসপাতালে যাও, পোর্স্টমর্টেম করাও। বজ্জাত সব। শেষে কাউন্সিলর হাবুলদা জগাছার ওদিকে রাজা ডাক্তারের কাছে সার্টিফিকেট নিয়ে এল বারোটায়। তারপর হল সৎকার।

বৃষ্টি বেশ জোরেই শুরু হল। সবাই পা চালিয়ে, সাইকেলে চেপে যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। পাড়ায় এসে সৌরক একবার পঞ্চাননবাবুর বাড়িতে যায়। অমিতা বেড়িয়ে আসে। সৌরভ জিজ্ঞাসা করে,—এখন শরীর ভালো তো? একটু সরবত খেয়ে নাও।

—আর সবাই এল না?

—আর, এই বৃষ্টিতে। মিটে গেছে। সব যে-যার বাড়িতে চলে গেছে। আমিও আসি। আগুন ছুঁয়ে, নিমপাতা, ছোলা মুখে দিয়ে, লোহা ছুঁয়েই বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

গেটে এক অমিতা এসে দাঁড়ায়।

পঞ্চাননবাবুর শ্রাদ্ধের দিনও শ্মশানবন্ধু ও পাড়ার কেউই যায় না। রাতে অমিতা সৌরকের বাড়িতে ডাকতে আসে।

—সৌরকদা তুমি আসবে না? তোমার বন্ধুরাও কেউ আসেনি?

অমিতার মুখে তুমি ডাকটা শুনে সৌরকের মনটা একটু নরম হয়ে যায়।

—ওরা আসতে পারবে না। ওদের ক্যাটারিং ডিউটি আছে তো।

—আমি আসছি।

অমিতা দাঁড়িয়েই থাকে। এক প্যাকেট মিষ্টি, ধূপ, ফুলের মালা নিয়ে সৌরক যায়। সৌজন্যতা দেখিয়েই—নেমতন্ন আছে, বলে কেটে পড়ে।

অমিতা বাবার অফিসে চাকরি পায়। এক বৃষ্টির রাতে আবেগ-ঘনিষ্ঠভাবে অমিতাকে একটি ছেলে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। অমিতা সেই আলিঙ্গনের ছোঁয়াকে মনে রেখেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ে।

কমপিউটার সেন্টারে সৌরকের আর বসা হয় না। একদিকে প্রোগ্রামিং শেখানো। অন্যদিকে সফট্ওয়ার ডেভেলপমেন্ট সুপারভাইজ করা, আবার সন্ধেয় কমপিউটার পার্টস্, হার্ডওয়ার-সেলস্ নেটওয়ার্ক ম্যানেজ করা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত নটা তো হয়। বাড়ি ফিরে মায়ের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব, তারপর একটু টিভি দেখা। সময় আর কাটে না। রাতে খাওয়ার পর একটু লেখালেখি, না হলে বইপড়া তো আছেই। বাড়িতে মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগে। রোজগার হচ্ছে, একা লাগে। শালা স্টুডেন্ট লাইফে মেয়েগুলো সব ঠকিয়ে কোশ্চেন, নোটস্, বই নিয়ে পালিয়ে গেল। লীনাও নেটে বর ফিট করে ফরেনে চলে গেছে। শীলা কানাডায়। অমিতাও বৃষ্টিতে ভিজিয়ে চলে গেল। সৌরকের ঘুম আসে না। নানান ভাবনায় মাথাটা ঝিম ঝিম করে,—আমি সত্যিই ফ্যালনা। সবাই কেবল কেটেই যাচ্ছে। আমি নিজে ভীষণ ছোট হয়েই গেলাম।

বাড়িতে মা বুঝতে পারে ছেলের অবস্থা। তাই ঘটক, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধুদের মাধ্যমে প্রায় প্রতি রবিবার মেয়ে দেখা শুরু হয়। কখনও সৌরকের পছন্দ হয় তো মেয়েপক্ষ চাকরি দেখে বাতিল করে; আবার কখনও সৌরকের পছন্দ হয় না, তখন মেয়ের বাড়ি থেকে চাপ আসে। এই টানাপোড়েনে জেরবার সৌরককে আর একটা মেয়ে দেখিয়েই ফাইনাল করার কথা নেয়, নকুল ঘটক, বলে দেয়—ফাইনাল হলে তুমি ছোটবেলা থেকে চেনাশোনা, তাই পাঁচ দেবে। মেয়েপক্ষ থেকে আমি দশ নেবোই। এরকম ঘর আর ছেলে, ওরা পাবে কোথায়? ঘটক, একজন বন্ধু, বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবেশী ও মাকে নিয়ে সৌরক জোড়াবাটিতে জি. টি. রোড থেকে একটু ভেতরে তোলা পুকুর লেনে মেয়ে দেখতে যায়। বাবা নিমাই বাগচি ইলেকট্রিকের ব্যবসাদার, মা মলয়া বাগচি সাধারণ ঘরোয়া মহিলা, ভাই মিলন বাগচি স্পেশাল চাইল্ড। বয়স বারো, মেয়ে মিতাশা বাগচির সঙ্গে শেষে আলাপ। সানাইয়ের পোঁ-এর মতো একই কচকচি—গান জানো, সেলাই পারো, রান্না কী কী করতে পারে, চুলটা কেমন? একটু হেঁটে দেখাও। মিতাশা ফর্সা, গোলগাল গড়ন, ঘরোয়া অথচ সুন্দরী, মাঝারি হাইট, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। মাথাটা নামিয়ে বসে। সৌরকের দেখেই পছন্দ হয়।

বড়রা ওদের দুজনকে একা রেখে ভেতরে আলোচনায় চলে যায়। সৌরক স্ট্রেট ফ্লার্ট করে—শাড়ির রঙটা কিন্তু খুব সুন্দর, বেবী পিঙ্ক না? দারুণ মানিয়েছে তোমায়।

মিতাশা হালকা হাসে, বলে—ধন্যবাদ।

—কোথাও রিসেন্টলি বেড়াতে গেছো?

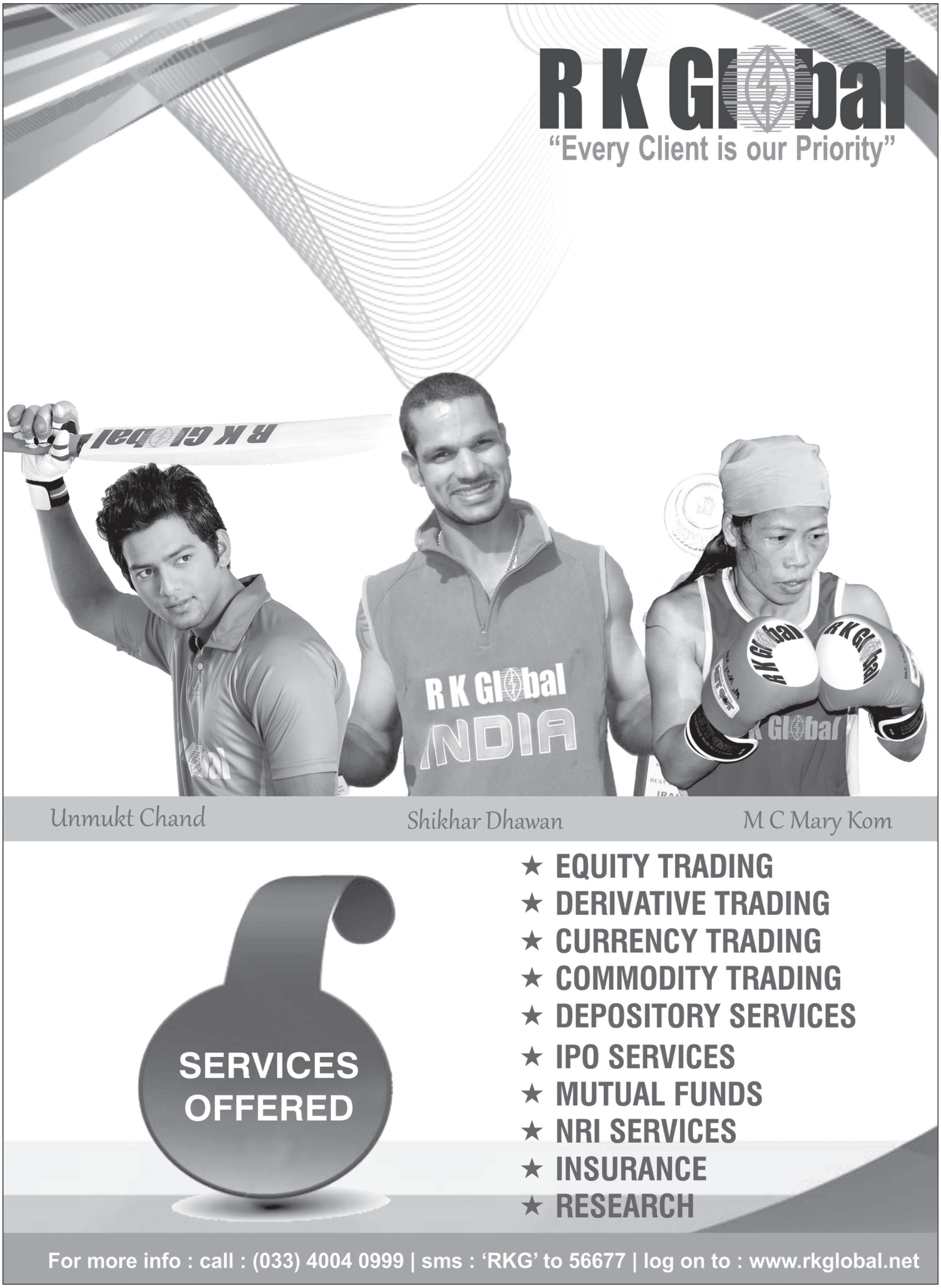
R K Global
"Every Client is our Priority"
R K Global
R K Global
INDIA
R K Global
Unmukt Chand
Shikhar Dhawan
M C Mary Kom
SERVICES OFFERED
★ EQUITY TRADING
★ DERIVATIVE TRADING
★ CURRENCY TRADING
★ COMMODITY TRADING
★ DEPOSITORY SERVICES
★ IPO SERVICES
★ MUTUAL FUNDS
★ NRI SERVICES
★ INSURANCE
★ RESEARCH
For more info : call : (033) 4004 0999 | sms : 'RKG' to 56677 | log on to : www.rkglobal.net

—হ্যাঁ গেছি তো পুরী, দার্জিলিং, গ্যাংটক, বকখালি...

—বকখালিতে জঙ্গলের মাঝে বনবিবির মন্দির, এগারো মাথার খেঁজুর গাছ দেখেছ।

—পুরীতে সন্ধেবেলা মন্দিরের পতাকা পালটানো দেখেছ। কত লোকের ভিড় হয়।

—না, দেখা হয়নি। রোজ হয়?

—হ্যাঁ। ওটা না পাল্টালে তো জগন্নাথদেবের ভোগ নিবেদনই হবে না।

—আপনি কোথায় ঘুরেছেন?

—আবার আপনি, আজ্ঞে শুরু করলে। সময়ে তালে রি-ওয়াইন্ড করতে হবে। পড়ে যাবো না উলটে।

—আপনি থুড়ি তুমি বেশ কথা বলো তো।

—আমার ঘোরা বেশিরভাগ বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ে না হলে জঙ্গলে।

—দু'একটা নাম বলো না...

---ওড়িশার কুলডিহার জঙ্গলে। ভিতরকণিকার কুমিরদের এলাকায়...

—কুমির দেখেছ?

—জলের ধারে দু'ফুট থেকে দশ ফুটের...

—আর পাহাড়ে?

—সান্দাকফু, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, তুঙ্গনাথ—এগুলো সব ট্রেক রুট।

—আমরা মেয়েরা পারব না।

—কেন? কত মেয়েই তো যাচ্ছে। সঙ্গে হেঁটে যাওয়া আর দেখার মজাটাই আলাদা, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-এ জুলাই-আগস্টের বর্ষার মাঝে যখন দুই থেকে তিনফুটের বড় বড় ব্রহ্ম কমল দেখবে, তখন সব কষ্ট গলে জল।

—কিরে? সৌরক, সব জল ঢেলে দিলি নাকি রে?

মিতাশা একটু লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলে। মনে মনে সৌরককে কেমন যেন ভালো লেগে যায়। সৌরকেরও মিতাশার প্রতি মন পড়ে থাকে। দিন-তিনেক পরে সন্ধেবেলা মিতাশার বাবা, মা, জ্যাঠা, মামা, মামি সব বাড়ি দেখতে আসে। সৌরক, মা, পাশের বাড়ির কাকু আর ঘটক সবাই মিলে আন্তরিক আপ্যায়ন করে।

সৌরকের আঁকা ছবি, লেখালেখির নমুনা, বাড়ি, সৌরকের ঘর সবই মন দিয়ে দেখেন। নিমাইবাবু ব্যবসাদার মানুষ, ওসবের মধ্যে নেই। টাকাপয়সার লেনদেন নিয়ে সোজাসাপটা কথা বলে, বৈশাখের মাঝামাঝি একটা দিন মৌখিক স্থির করেন।

এক সপ্তাহ পরে, সৌরকের মা খবর দিয়ে মামা, কাকা, জ্যাঠাদের সঙ্গে পরামর্শ করে। রবিবার দিন দেখে আবার একবার মেয়ের বাড়ি যাওয়া হবে, স্থির হয়।

এর মধ্যে লোকজনের মারফত নগদ কিছু টাকা, মিতাশার হাতের, ব্লাউজের আর চটির মাপ এসে যায়।

রবিবার খোশমেজাজে আবার সৌরক মাকে নিয়ে কাকা, জ্যাঠা, মামার সঙ্গে সন্ধেয় মিতাশার বাড়িতে হাজির হয়। সবাইয়ের সঙ্গে আবার একবার আলাপ হয় মিতাশার। দু-চারটে কথা হয়। তারপর বড়রা উঠে ভেতরে ঘরে চলে যায়।

মিতাশা উচ্ছ্বাসে বলে—বেশ, আড্ডা হচ্ছে, বলো।

সৌরক—গল্পগুজব, আড্ডা না হলে বাঁচা যায়, বলো।

মিতাশা—সত্যি বলো। গোমরা মুখ আমি একদম দেখতে পারি না। তোমার কী খেতে ভালো লাগে?

সৌরক—আমি সবই খেতে ভালোবাসি। তবে মোগলাই খানাবিশেষ পছন্দ। তোমার কী পছন্দ?

মিতাশা—আমার সবই ভালো লাগে। তবে গরমাগরম চাইনিজ দারুণ।

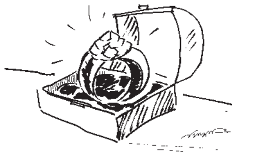

—না, না। এটা সাধারণ নয়। দারুণ ব্যাপার। নিমাইবাবু উত্তেজিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

সৌরকের মামা অনুনয়ভাবে বলেন—আমরা তো ভুল স্বীকার করে নিয়েছি।

—না, না। এটা ভুল স্বীকার নয়। বংশমর্যাদায় অপমান করা। আপনাদের বংশপরম্পরায় কী রীতি আছে; আমি জানবো কী করে?

বাবার রাগে, চিৎকারে মিতাশা চমকে ওঠে। সৌরক একেবারে মুষড়ে পড়ে। বাড়িতেই বাবাকে বারণ করেছিল—ওসব বলতে যেওনা। কেঁচে যাবে।

—তুই ছেলেমানুষ। বুঝিস না। একটা দাও মারতেই হবে।

আসলে কাকা যে মনে মনে প্যাঁচ কষে এসেছে, সেটা বুঝতেই দেয়নি। মা আর ছেলে একা। কোনও ঝামেলা নেই। দাও, একটা গণ্ডগোলের বীজ পুঁতে।

—আপনারা আসুন। এখানে আমি কাজ করবো না। সব ফেরত দেওয়ার জন্য ক'দিন সময় লাগবে?

সৌরক মাথা নীচু করে বলে—আত্মীয় স্বজনকে সব খবর দেওয়া হয়ে গেছে। ফার্নিচার বানাতে দিয়েছি। কেনাকাটাও শুরু করেছি। আমি তো একা মানুষ।

—আমিও একা। আমাকেও সব সামাল দিতে হবে। দশদিন সময় দিলাম, সব বুঝে ফেরত নিয়ে আসব। নিমাইবাবু ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যান।

সৌরকের মা মলয়াকে বলে—আপনি একটু বোঝাবেন। অ্যাতদূর কথা এগিয়ে গেছে। আমরা তো ভুল স্বীকার করেই নিয়েছি।

মিতাশা মাকে জিজ্ঞাসা করে—মা কী নিয়ে গণ্ডগোল?

মলয়া হতাশায় ভেঙে পড়ে—আর কী বলবো রে? ওরা ছেলের জন্য একটা হীরের আংটি দাবি করে।

সৌরকের মা সঙ্গে সঙ্গে বলে—দাবি বলবেন না। ওটা একটা আবদার ছিল।

মলয়া বলে—ওসব আবদার ও রাখবে না। বড্ড জেদি মানুষ। একরোখা। চুপচাপ সৌরক আর সবাই বেড়িয়ে যায়।

মামা, কাকা, জ্যাঠা সবাই একসঙ্গে বলে—আরে ছেলে তুই। ভেঙে পড়ছিস কেন? আমরা তো আছি। ওরকম হাজারটা মেয়ে পাবি তুই। আর, হীরের আংটি না পরালে, আমরা তোর বিয়েই পাকা করবো না।

সৌরক মনে মনে ভাবে—একটাও জুটছিল না। যাও বা একটা জুটল, শালা, তাও দিল ভেস্তে।

বাসটা লেভেল ক্রসিং-এ দাঁড়াল। ট্রেন পাস হবে। পাশেই স্টেশনের কথা শুনেই দুদ্দাড় করে নেমে মামারা সবাই ট্রেন ধরতে ছুট লাগাল।

—পণ্ড হলো বর সাজা,—সৌরক এবার তুই ব্যাল বাজা; কোন সুরে গাইবে ঠিক করতে পারে না। মায়ের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়। বাড়ি ফিরেই সব অর্ডার ক্যান্সেল করাতে হল। অ্যাডভান্স ফেরত নিতে, এবার কালঘাম ছুটবে। সবাইয়ের কৌতূহল মেটাতে যাকে যা পারছে, সৌরক বলে যায়। সবাই একটা চাপা মজা অনুভব করে। মা ও ছেলে বেশ জব্দ হয়েছে।

পরের দিন রাতে সৌরক আর ওর মা আবার মিতাশাদের বাড়ি যায়। মিতাশা দেখা করে না। মলয়া জানায়—আর কিছুই সম্ভব নয়। উনি পরের মঙ্গলবার যাবেন। যা যা বলেছেন, সেইমত রেডি রাখবেন। আচ্ছা নমস্কার। আসুন।

একগ্লাস জল নয়। একটু আপ্যায়ন ছাড়াই চলে যেতে হল। মানুষ এত পালটে যায়।

যাইহোক, মঙ্গলবার নিমাইবাবু সঙ্গে এক মিস্ত্রী চ্যালাকে নিয়ে দানের অগ্রিম টাকা, ব্লাউজের মাপ, চুড়ি মাপ, জুতোর মাপ সব ফেরত নেন। আর সৌরকের আংটির মাপটাও ফেরত দিয়ে যায়। চুপচাপ চলে যান।

যথারীতি ১৬ই বৈশাখ সানাইয়ের পোঁ বেজে ওঠে। জিদের বশে ছেলের ব্যাপারে বড়ো একটা খোঁজখবর নেন নি। ধুমধাম করে, মিতাশার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দ-উচ্ছ্বলতার কেমন যেন জৌলুস ছিল না। বিয়ের কনেই কেমন যেন মনমরা। সবাই দেখে বলে—বউ বড়োই ভাবুক হবে গো। মলয়া যন্ত্রের মতো দায়িত্ব পালন করে যান। অনুষ্ঠান সব যেন চলনসই, নিষ্প্রাণ,...

মিতাশা আর মলয়ার মন পড়ে আছে; হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল সৌরকের কাছে। মিতাশার জীবনের বাইরে শুধুই একটা বিবাহিতের লেবেল সেঁটে দেওয়া হল।

সৌরকের আর বিয়েই হয় না। ক্রমশ চাকরি আর ব্যবসায় নিজেকে আরও জড়িয়ে ফেলে। ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে গ্রাফিক্স ভিসুয়ালাইজার ও ডিসপ্লে এজেন্সী চালু করে। স্মার্ট সেলস্ এক্সিকিউটিভদের ডেমো ফাইল দিয়ে নানা কোম্পানি ভিজিট করায়। বিভিন্ন কোম্পানির কন্ট্রাক্ট সাইন করতে করতে কাজের ভল্যুম অনেক বেড়ে যায়। ব্যবসার ব্যস্ততার ফাঁকে কখন যেন বয়সের ভারে মা আরও একা হয়ে পড়েন। এর মধ্যেই আর্কিটেক্ট দিয়ে নতুন বাড়ির প্ল্যান ও কনস্ট্রাকশান শুরু হয়ে যায়, শহরের পশ এলাকা মাধবপুরায়। বাড়ি বদলের ঝক্কিঝামেলা সৌরকের মা আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। নার্সিং হোমে রেখে উন্নতি হয় না। সকালে বিকালে ভিজিটিং আওয়ার্সে একবার হাজিরা, একটু খোঁজখবর, বেডের কাছে গেলেই—মায়ের দু'চোখে জলের ধারা, একটাই অনুনয় বিয়ে কর, সুখী হও। শেষদিকে আর কথা ছিল না। শুধু লাইফ সাপোর্ট চলছিল। বৃষ্টি ভেজা এক সকালবেলা সৌরকের মা সব মায়ার বাঁধন কাটিয়ে চলে গেলেন, কোন অচিনপুরীতে। এখন বন্ধুদের শুধু একটা ফোন। শ্মশানে যাবতীয় কাজ, দায়িত্ব নিয়ে নিশ্চিন্তে মিটিয়ে দেয়। এক ঝলক শুধু বিদ্যুতের জ্বলন্ত চুল্লীর ছোঁয়ায় মায়ের দেহটা কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দড়াম্ করে চুল্লীর দাজা বন্ধ হয়ে যায়। গঙ্গার ঘাটে অতিথি শালায়, এ যেন গহন অন্তহীন অপেক্ষা। নশ্বর দেহের শেষ চিহ্ন গঙ্গার বুকে বিলীন করতে হবে। শ্মশানযাত্রী আর অতিথিদের শ্রাদ্ধবাসরে আপ্যায়ন, পুরোহিতের বুজরুকির দান গ্রহণ আর ডাঁই করে বাড়িতে জমানোর মাঝে না কী হিন্দু ধর্মের সারমর্ম লুকিয়ে আছে। যতদিন ন্যাড়া মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে পারবে, ততদিন এই সমাজের সবাই দু'হাতের কনুই পর্যন্ত কাঁঠালের গড়িয়ে যাওয়া রস চেটে চুষে খেতে থাকবে।

—সৌরক, ওঠ্ রে। হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চল্।

সব মিটিয়ে, পুরোনো সব স্মৃতিকে পেছনে ফেলে, দরোয়ান এখন গেট খুলে দেয়, প্রতিষ্ঠিত ব্যস্ততম ব্যবসায়ী সৌরক বোসের গাড়ি ঢোকার জন্য। অনন্ত স্নানের সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। রীতি অনুযায়ী পুরোহিতের কথা মেনেই সৌরক মায়ের শ্রাদ্ধ কাজের দায়িত্ব মিটিয়ে নেয়।

মিটছে না ব্যস্ততা। হঠাৎই মোবাইল বেজে ওঠে। তিনবার বেজে থেমে যায়। সৌরক ঝট্ করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আজ কোনও ফিজিকাল ওয়ার্কআউট করে না। পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অভ্রকে ফোনে জরুরি কিছু কাজের জন্য বলে। দীপক এখন বাগানের দায়িত্বে আছে। ওকে ডেকে গাছপালা পেস্টিসাইড বিষয়ে কিছু কথা বলে নেয়।

—রতনদা, ব্রেকফাস্ট রেডি। আমি একটু বেরোব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি বসো। আমি গুছিয়ে আনছি।

ওয়াটার পোচ, ফলের রস, ওটস্-এর সঙ্গে সৌরক চোখ বোলায় খবরের কাগজের হেড লাইনসে। আবার মোবাইলটা বেজে ওঠে। দুবার। সৌরক উঠে পড়ে। ঠাকুর ঘরে যায়। দু'মিনিটে চোখ বুজে হাত জোড় করে প্রার্থনায় বসে। রেডি হয়ে নীচে নামে। অনন্ত ব্রীফকেসটা এগিয়ে দেয়। দরোয়ান গেট খোলে। মোবাইলটা একবার বাজে। সৌরকের গাড়ি বেড়িয়ে যায়।

টোল প্লাজা পেরিয়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি। মনসাতলার বাইপাসে গাড়িটা নামিয়ে দিয়ে মোরামের রাস্তা ধরে এগোয়। সবুজ গাছপালার মধ্যে দিয়ে সকালের নরম আলোয় সৌরকের গাড়ি খানাখন্দ আর ভ্যানরিক্সা বাঁচিয়ে ২০ থেকে ৩০ স্পীডে হজির হয়। গৌরীপুর সেতুর কাছে। মোবাইল বাজলেই, অ্যাক্সিলেটারে চাপ গোঁ গোঁ করে বাঁদিকের অ্যাপ্রোচ রোড ধরে ধরে গাড়িটা তোলে এক্সপ্রেসওয়েতে। সোজা লেন ক্রস করে নেয়। এখানে কোনও পুলিশী নজরদারি নেই। প্রায় ৬০ স্পীডে গাড়ি নিয়ে এগোয়। সকালে দুদিকের লেনেই গাড়ি কম। দু-একটা গাড়ি, ট্রাক আর মোটর বাইক। কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ে এক্সপ্রেসওয়েতে একটা পুলিশের সুমো আর বলেরো-এর মধ্যে চেজিং। সৌরক উল্টোদিকে থেকে এগোয়। ফায়ারিং চলছে। সৌরক একবার মাথাটা বার করে। কলিশন এড়াতে বলেরোটা বাঁদিকে কাটাতে যায়। সাইড স্কাড সামলাতে না পেরে, অনেক নীচে ঢালু জলায় গড়িয়ে, কাদায় গেঁথে যায়। সৌরকের গাড়িটা ফুল স্পীডে বাঁদিক-ডানদিক করতে করতে পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মারে। এগিয়ে যায় সামনে। পাশের একটা গাছে ধাক্কা মারে সজোরে। স্টিয়ারিং-এ সৌরক মাথা এলিয়ে অজ্ঞান। কাঁধ থেকে অঝোরে রক্ত বেরোচ্ছে। পুলিশ অফিসার সুমন্ত সেন গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে যায়। ট্রাফিক চালু রাখার ব্যস্ততায় বোলেরোর কথা কয়েক মুহূর্ত ভুলে যায় পুলিশ। আস্তে আস্তে বোলেরোর দাজা ঠেলে তিনটে সুটকেশ বেরোয়। একজন দাড়িওলা লোক ও একজন জিনস্ গেঞ্জীপরা মহিলা বেরিয়ে আসে। কাছাকাছি গ্রামে তখনও খবর যায়নি। এদিকটা বেশ নির্জন। পুলিশরা সবাই সৌরককে নিয়ে ব্যস্ত। গাড়িতে বোতাম টিপে একটা কালো বাক্স ফেলে দেয়, ফোল্ডিং স্টিলের পাইপের সাপোর্টে কাদা থেকে বেড়িয়ে ঝোপের আড়ালে চলে যায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্থানীয় থানা থেকে ফোর্স হাজির।

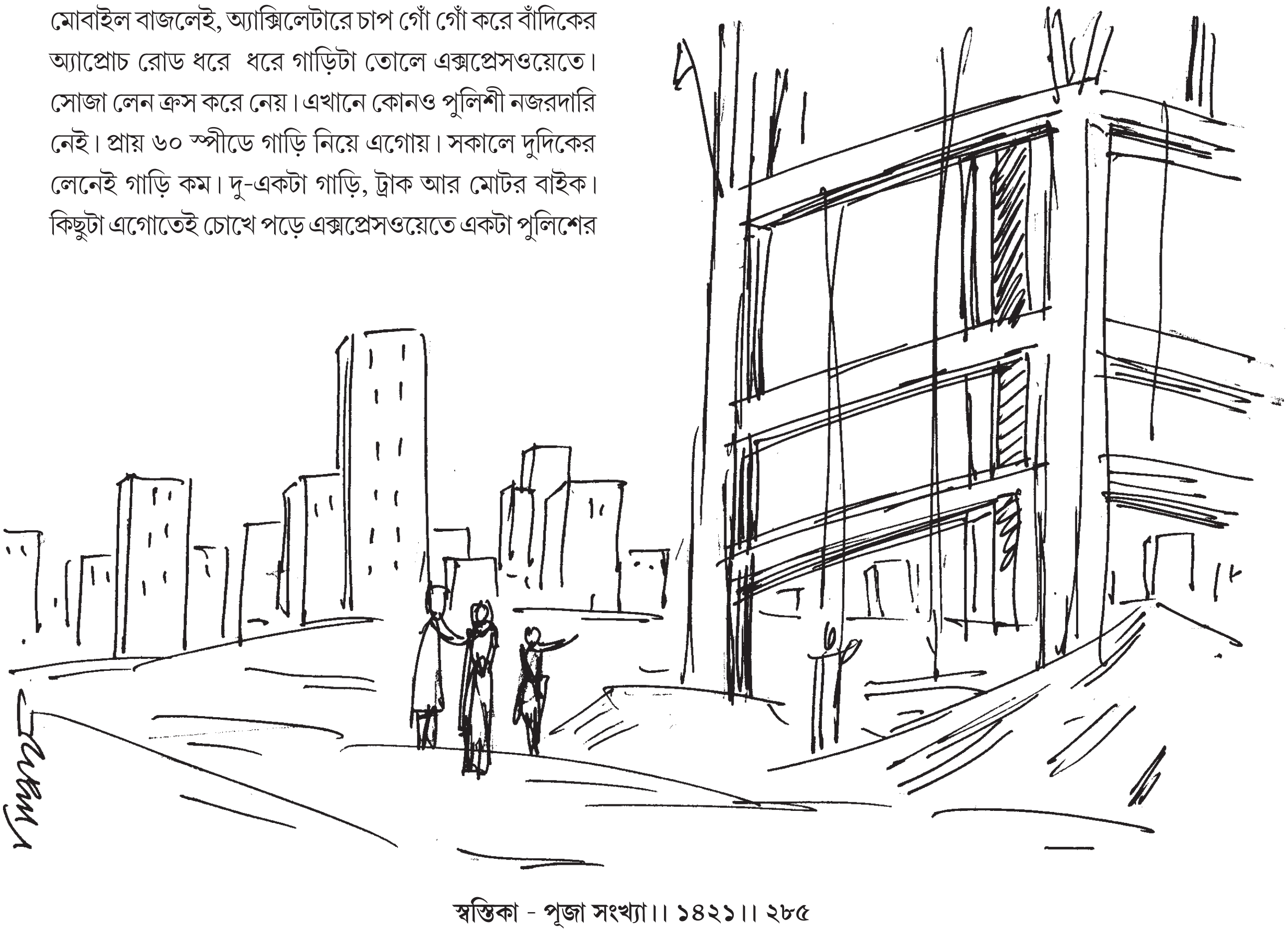

শারদীয়ার প্রীতি-শুভেচ্ছা ও
ভালোবাসা..

Murlidhar Ratanlal Export Limited

ঢালু জমি দিয়ে সন্তর্পণে নেমে আসে পুলিশ। পা হড়কে দু-তিনজন একদম নীচে। খোলা রিভলবার নিয়ে ওরা ঘিরে ফেলে গাড়িটা। স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে একটা লোক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। স্পেশাল অফিসার সুনীল ছেত্রী ভাবে—আরে উইন্ড শীল্ডে বুলেট ফ্র্যাকচার নেই। গাড়ি কলিশন হয়নি। তাহলে এ্যাত রক্ত কেন? এই ভাবনার কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা। তিনজনেই আর একটু এগোয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পুলিশরা ছিটকে যায়। বোলেরোর কাঠামোটা টুকরো-টুকরো।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঋতিকা এক জায়গায় ঝোপের আড়লে দাঁড়ায়। তাহির ঝটপট রুকস্যাক আর ব্যাকপ্যাকে সব মাল ভরে ফেলে। জল কাদায় মাখা পাদুটোকে পরিষ্কার করে নেয়। ছুঁড়ে ফেলে দেয় সুটকেশ অন্ধকারে ঢাকা জলা পুকুরে। ময়লা কাগজ, কাপড়ে ডিওডোরেন্ট স্প্রে করে জ্বালিয়ে দেয়। তাহির বলে—চলো, এবার এগোনো যাক। শালা, এই পয়েন্টটা মধু, আসিফ আর যোহানের গ্যাঙ জানে না।

ঋতিকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—এবার মাইরি, গ্যারেজের পল্টুটা বেশি ভাও খেয়ে নিল। কী দরকার ছিল বোলেরো ওড়াবার।

তাহির—আরে ছাড়ো, থানার কেসের মাল। ও শালা, কোন পার্টি নিতে আসত? ইনসিওরেন্সকে তো বস্‌ই...আরে চলো, চলো। বসের আপডেট দিতে হবে।

ঋতিকা আর তাহির বেশ খানিকটা হেঁটে একটা সরু, মোরামের পথে পৌঁছোয়। ডানদিকে বেশ কিছুটা গিয়ে, একটা ছোট্ট গ্রাম বীরশিবপুর। মুরগি, গরু, ছাগল এদিক ওদিক ঘুরছে। তুলসী মঞ্চ, কাঠের বেড়া, দড়িতে জামাকাপড় মেলা। বেশ কিছু বাড়ি। রাস্তায় সাইকেল। দু-চারটে দোকান। একটা চায়ের দোকানে ঋতিকা আর তাহির বসে। চায়ের অর্ডার দেয়। ঋতিকা মোবাইলের সিন পালটায়। দু-চারটে কথা হয়।

লোকমুখে অ্যাকসিডেন্ট আর ইনজুরির কথা ছড়িয়ে পড়ে। টিভির ব্রেকিং নিউজে আসে—আজ, সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সৌরক বোস গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে আছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি হীরক ঘোষ।

—হ্যালো, হীরক, তুমি এখন স্পটে। ঠিক কী হয়েছিল যদি আমাদের জানাও।

—হ্যালো সায়ন্তিকা। আজ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গৌরীপুর সেতুর কাছে পুলিশের একটি সুমো আর দুষ্কৃতীদের একটি বোলেরোর মধ্যে চেজিং চলছিল। খবর ছিল, গাড়িটাতে বেশ কয়েক কোটি টাকার বেআইনি জিনিসপত্র পাচার হচ্ছে। দু পক্ষের মধ্যে ফায়ারিং চলছিল। হঠাৎই সেখানে সৌরক বোসের গাড়ি প্রচণ্ড স্পীডে লেনের আইন অগ্রাহ্য করে উল্টোদিকে থেকে ঢুকে পড়ে। এই সময় সম্ভবত তিনি দেখার জন্য মাথা বার করেছিলেন। তার গাড়িতে বেশ কয়েকটি ও কাঁধে একটি বুলেট লাগে।

—আপনারা শুনলেন আমাদের প্রতিনিধি হীরক ঘোষের কথায় প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সৌরক বোসের আজ সকালে আহত হওয়ার খবর। ফিরে আসছি বিজ্ঞাপন বিরতির পর। কোথাও যাবেন না। চোখ রাখুন জনগণের খবর নিয়ে একেবারে আপনাদের কাছেই হাজির—'জনবার্তা'।

নেটওয়ার্কে খবর ছড়াতেই 'লাইফ কেয়ার' নার্সিং হোমে ভিড় বাড়ে। পুলিশের তত্ত্বাবধানে আহত সৌরককে আনা হয়েছে। এখন অপারেশন চলছে। শহরের বাইরে থাকায় এখনও কোন প্রেসের ঝামেলা শুরু হয়নি। অফিসার সুমন্ত সেন অনর্গল একটার পর একটা ফোন করছেন। তারপর একজন ডিউটি অফিসার ও চারজন কনস্টেবল রেখে গাড়িতে বেড়িয়ে যান। কিন্তু গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করতে হয়। 'জনবার্তা'-এর ক্যামেরা আর রিপোর্টার হাজির।

—এখন কী অবস্থা সৌরক বোসের?

—অপারেশন চলছে। যথেষ্ট ব্লাড লস হয়েছে...

—এখানে আনা হল কেন? এই রিমোট প্লেসে? কোনো সরকারি হাসপাতালে...

—এখান থেকে কাছের সরকারি হাসপাতাল মানে সব লাইফ স্যাপোর্ট আছে...এর ডিস্‌টান্স কত জানা আছে? সুমন্ত একটু হেসে বলে---প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। অতক্ষণ পেশেন্ট-এর ট্রমা সামলানোর কনডিশান ছিল না।

—এই জায়গায় ট্রমা কোথায় আছে তো?

—আমরা আমাদের তরফ থেকে বেস্ট লাইফ সাপোর্ট দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করেছি। প্লিজ, আমাকে একটু স্পটে যেতে হবে।

আপনারা পুলিশের মতামত শুনলেন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী আহত সৌরক বোসের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে; ক্যামেরায় রজত সেন-এর সঙ্গে আমি সুবীর নন্দী, জনবার্তা, বীরশিবপুর।

আমরা যোগাযোগ করেছি আমাদের প্রতিনিধি হীরক ঘোষের সঙ্গে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, আজ সকাল সাড়ে আটটায় গৌরীপুর সেতুর কাছে, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে পুলিশ ও দুষ্কৃতীর গুলির লড়াইয়ে আহত হন ব্যবসায়ী সৌরক বোস। তিনি একটি বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি আছেন। তার অবস্থা সম্পর্কে কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

—হ্যালো, হীরক। এখন বলো তুমি কী জানতে পেরেছ?

—গৌরীপুর সেতুর কাছে দুষ্কৃতীদের বোলেরো গাড়িটি

সৌরক বোসের গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে পাশের জলায় পড়ে যায়। গাড়িতে সম্ভবত দুই-তিনজন ছিল। স্থানীয় থানার তিনজন পুলিশ গাড়ির কাছাকাছি যেতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গাড়িটি নষ্ট হয়ে যায় ও তিনজনেই মারা যান। এখন এখানে পুলিশী নজরদারিতে মৃতদেহ তোলা, গাড়ির নমুনা সংগ্রহ—এইসব চলছে। উপরের দিকে যে কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বলছেন— ওপর থেকে গাড়িটি ফাঁকাই দেখাচ্ছিল। কোনও আরোহী ছিল না। কেবল রক্তমাখা একজন ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এ এলিয়ে পড়েছিল। এখন এখানে পুলিশী কর্ডন করে, ব্যস্ততা তুঙ্গে।

—আপনারা শুনলেন দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের সাংঘাতিক দূর্ঘটনা ও প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সৌরক বোসের আহত হওয়ার খবর।

—আরও বিস্তারিত খবর নিয়ে ফিরছি এখনই। কোথাও যাবেন না, চোখ রাখুন জনগণের খবর নিয়ে একেবারে আপনাদের কাছেই হাজির—'জনবার্তা'।

ঋতিকা ও তাহির গল্প করতে করতে হাজির হয়ে যায়, গড়ের ধার বাইপাসে। সুজন হুড খোলা জিপসি নিয়ে অপেক্ষায়। সামনের র‍্যাক থেকে বীয়ারের ক্যান বার করে দেয়। আঃ বাঁচালি মাইরি। তাহির ঝট্ করে তোয়ালে নিয়ে পাজামা পাঞ্জাবিতে ভোল পালটায়। ঋতিকা জিনস্ টপস্ থেকে লং স্কার্ট আর শার্ট পরে নেয়। জিপসির ফুটবোর্ডে একটা স্পেশাল ওখানে স্পেশাল চেম্বারে চালান কর দেয়। সুজন গাড়ি স্টার্ট করে। তাহির আর ঋতিকা পিছনের সিটে বসে। নীল আকাশে সাদা সাদা পেঁজা তুলের মতো মেঘ। রোদের বেশ তাত। সুজন চট্ করে সানগ্লাস বার করে। ঋতিকা, তাহিরও সানগ্লাসে ঢেকে নেয় ক্লান্ত চোখ। রাস্তার দু'পাশে নাম-না-জানা কত সবুজ গাছ শুধুই সরে সরে যায়। কখনও নাকে আসে বুনো ফুলের গন্ধ বা চেপ্টে যাওয়া মরা জন্তুর গা-গুলোনো ভ্যাপসা গন্ধ। হঠাৎই সাদা কালো মেঘে আকাশটা ঢেকে যায়।

হেডলাইনস্ থেকে সাদা কালো ফিলার নিউজ হয়ে হারিয়ে যায় সৌরক বোসের খবর। সৌরক বাড়ি ফিরে এসেছে। এখন একটু রেস্টে থাকতে হবে। অনন্ত ফলের রস আর টোস্ট নিয়ে আসে, চিন্তিত মুখে বলে—দাদা, এসব রিস্কের কাজ, এবার ছাড়ো না। সৌরক মৃদু হেসে বলে—আরে ছাড়লে হবে? তোমাদের স্যালারি দেবো কী করে? তোমাদের চলবে?

—ওঃ, ঠিক হবে। এসবে এবার জড়িয়ো না।

---জানো, আমার প্রথম স্যালারির টাকায় মাকে পছন্দমতো একটা কাপড় কিনে দিতে পারিনি। শালা, আমাদেরই সেন্টারের মেয়ে এমন কাঁদুনি গাইল, আমি গলে গেলাম। আবার শপিং মিটিয়ে ট্যাক্সিতে বাড়ি ছেড়ে দিলাম। বিয়ে করল আর ফুড়ুত—নেমতন্ন পর্যন্ত করল না।

---ছাড়ো ছাড়ো ওসব কথা। এখন খেয়ে নাও। সন্ধেবেলা আবার বেরোবে না কী?

---হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালো কথা। মৃদুলকে একটু খবর দাও...মোবইলটা বেজে ওঠে।

—হ্যালো, অভ্র বলো। ইনসুরেন্স ক্লেম পাওয়া গেছে। পল্টুকে বলেছো তো গাড়ির সার্ভিসটা, —হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। কালারটা বুঝে করতে বলো। —কী, ব্রেকফেলের রিপোর্ট জমা পড়ে গেছে। এক্সলেন্ট। ব্যস, ব্যস। আচ্ছা, চলে তাহলে। বাই।

—অনন্ত, আজ একটু ভালো করে চান মাস্ট। সৌরক বাথরুমে যায়। শাওয়ার খুলে প্রাণখোলা গান করতে মন চায়। কিছু সুর-কথা আসে না মাথায়। খালি মনে পড়ে মিতাশার সেই হাসিখুশি গোল ফর্সা মুখ।

—ও এখন কী করছে? ও কী এখন চান করছে? ধুর সংসার সামলে চান করার কী ফুরসত পাবে? এ কী সৌরক বোস? অনন্ত, অভ্র, মৃদুল সর্বক্ষণ ছায়ার মতো ঘিরে রেখেছে। আমায় মিতাশা এখন চিনতে পারবে? ওকে কী আমি চিনতে পারব? প্রতিদিন কত লোক রাস্তায় দেখি...

বাথরুমে দরজায় নক করে অনন্ত—দাদা, মৃদুল এসেছে। বসিয়েছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি আসছি।

জিকাবো-এর কটন শার্ট আর ট্রাউজার্স গলিয়ে, গায়ে একটু আন্তন শঁভে স্প্রে, চুলটা সেট করে নীচে নামে সৌরক। মৃদুল সোফায় বসে লিকার চা-এ ব্যস্ত,—দাদা, কেমন আছেন?

—আরে, সব ঠিক তুমি এখনই বেড়িয়ে পড়ো। দুটো সিটি ব্রাঞ্চ থেকে অল্প করে আর সাবার্ব ব্রাঞ্চ থেকে হেভি উইথড্র করবে। তিনটে কোম্পানির ওয়েলফেয়ার অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট করবে। তারপর ছয়টা ডেবিট কার্ডে খেপ মেরে দিও। অ্যামাউন্ট সিম পালটে অভ্রর থেকে আপডেট নেবে। সন্ধ্যেয় ''সফট্‌পিজার' ডেলিভারী বয় দুটোকে স্পট করবে। ওরাই ক্যারিয়ার। গতবারের ওভ্রোন-এর কার্টনে প্যাক করে ক্যুরিয়র করে দেবে এক্সপ্রেস। সন্ধেয় আমি ডেলিভারি নিয়ে নেবো।

—আর, কত নেবো? প্ল্যান মাফিক 'হেলথ্ সেন্টার, ইমারজেন্সী সার্ভিস' প্লেটটা ঠিক তুলেয়েছি। এবারের ড্রাইভারের ড্যামিটায় একটু বেশি পড়ে গেছে। ঈদে খুরশিদ দেশে। তাই কাজটা মোটামুটি হয়েছে।

—ওদিকে রিপোর্টের কী হল?

—আর রিপোর্ট? তিনটে পেটি কেসের আসামীকে সাজিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি। যথা সময়ে 'সফ্ট পিজার' প্যাক

আর ক্লারিয়র প্যাকেট পৌঁছে যায় ভুবনপুরের এই রোড সাইড বাগান বাড়িতে। চারিদিকে গাছপালায় ঘেরা, গাড়ি পার্কিং-এর বিরাট জায়গা। ছ'টা ঘর। বেশ আরামের জায়গা। আয়েশ করে মিটিং হয়। জানলায় ভারি পর্দা ঝোলানো। সৌরক নিজের জন্য প্লেন ড্রেসের বাউন্সারের ব্যবস্থা রাখে। সব গাড়িই নানা সেন্টার থেকে ভাড়া নেওয়া।

সুমন্ত সেন বলে—এবারে কিন্তু আসিফ আর যোহান বর্ডার থেকেই ফলো করছিল।

সুনীল ছেত্রী যোগ করে—আমরা চেজ না করলে, মালটা ওরা এক্সপ্রেসওয়েতেই সাপটে দিত।

সৌরক চিন্তিতভাবে বলে—কিন্তু এভাবে ক'দিন?

সুমন্ত হাত নেড়ে বুঝিয়ে দেয়—শুনুন, শুনুন। আপনি বর্ডারেই হাত বদলানোর ঝামেলাটা এড়িয়ে যান। ওখানে স্থানীয় কিছু মেয়েকে লাগিয়ে দিন।

সুনীল সঙ্গে সঙ্গে বলে—বর্ডার থেকে বাকিটা 'ডট কম'-ডেলিভারির ভিড়ে মিশিয়ে দিন।

সুমন্ত বলে—কোনও এনকাউন্টার নেই। বাড়িতে বসেই মাল বুঝে নিন।

সৌরক খাবার, ডিংকস্ এগিয়ে দেয়—লেটস্ এনজয়।

সুনীল জিজ্ঞাসা করে—বাই দ্য ওয়ে, হাউ ইস ইওর উন্ড।

সৌরক হেসে বলে—দিস ইস হিলিং ফাস্ট বাট দ্য ডিপেস্ট ইন মাই হার্ট-পেনস্ এ লট।

সুমন্ত হো হো করে হেসে ওঠে আর বলে—ঋতিকা কিছু একটা অ্যারেঞ্জ করো।

ঋতিকা ট্রেতে বান্ডিল সাজিয়ে এগিয়ে দেয়। আমরা রেডি রেখেছি স্যার।

সুমন্ত আর সুনীল ছোট হ্যান্ড ব্যাগে গুছিয়ে নেয়। উঠতে উঠতে বলে— তুমি আর তাহির ক'দিন অ্যালেপ্পী চলে যাও। ব্যাক ওয়াটারে একটু এনজয় করে এসো। হ্যাপী জার্নি। গুড নাইট।

ওরা বেরিয়ে গেলে, সৌরক ঋতিকাকে ফাইল থেকে প্রিন্ট আউটগুলো দেয়। এবারে হয়তো ছটা বাড়তি কনসার্নে ছড়িয়ে দেবে। কমিশন বাড়িয়ে দেবে। লিস্ট অনুযায়ী মোবাইল, ল্যাপটপ, মাদার বোর্ড-এর চিপসেট, লেবেল, স্টিকার—সব রেডি করে দেবে। হার্ড ডিস্কগুলো দিল্লি আর লুধিয়ানায় পাঠিয়ে দেবে। অন লাইন ট্রন্সাকসান হবে। মেল আই. ডি ব্যবসা হয়ে গেলে উড়িয়ে দেবে।

—সোনা আর হীরেটা?

—ওই একটা ফালতু ঝামেলায় পড়ে গেলাম। যাহোক এখন চেপে যাও।

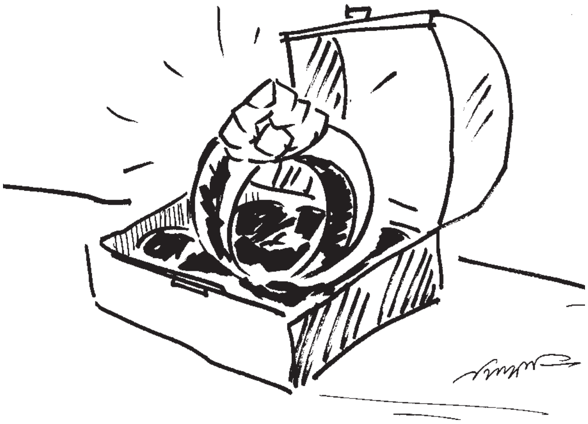

—তুমি বেরিয়ে পড়ো। আর ক'দিন এনজয় করে নাও।

দরজার কাঁচ দিয়ে সৌরক দেখে একজন বাউন্সার নিয়ে ঋতিকার গাড়ি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। একটা সিগারেট ধরায় সৌরক। আধো আলোয় বসে মৌতাতে মশগুল। মনের মধ্যে আবার ভেসে ওঠে মিতাশার মুখ।

মিতাশা এখন একটা সুন্দর ছিমছাম দোতলা বাড়িতে থাকে। ওর স্বামী অরিত্র মিত্র একটা প্রাইভেট কোম্পানি 'ওসুকা ইনফোটিক'-এর ম্যানেজার। রোগা, লম্বা চেহারা, মুখটা লম্বাটে। গাল বসা। চোখের চাহনিতে চালাকির ঝিলিক। মিতাশা সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট রেডি করে। স্নান করে অরিত্র মিতাশার গুছিয়ে রাখা জামা, প্যান্ট, রুমাল, টাই-এ ড্রেস করে। টেবিলে আসে।

মিতাশা জিজ্ঞাসা করে—আজ কখন ফিরবে?

অরিত্র বিরক্ত হয়—কী করে জানব? অফিসে নিত্যদিন একটা ঝামেলা।

—না, একটু বেরুতাম। কোথাও তো যাওয়া হয় না—

—এই তো, সানডেতে বাড়ি ঘুরে এলে...

—সে তো মায়ের শরীর খারাপ। দেখতে—

—ওসব এমনি-টেমনি ছাড়। যদি পারি, তাহলে চেষ্টা করব।

—একটা সিনেমা যাবে?

—সিনেমা! আরে স্ট্রিম করে নাও। দেখে শেষ করতে পারবে না।

ওকে, বাই—

অরিত্র ঝাঁ করে গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে যায়। মিতাশা যন্ত্রবৎ দোতলার বারান্দায় দাঁড়ায়।

—গুড মর্নিং, স্যার। শুনতে শুনতে অরিত্র শুধু নড করে আর মর্নিং বলতে বলতে নিজের কেবিনে গিয়ে বসে। ফাইলগুলো খুলে দ্যাখে। সেক্রেটারি লিওনকে ডাকে। মিটিং ব্রীফ রেডি করতে বলে। অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো জেনে নেয়।

বর্ণয়াল আয়ুর্বেদ ভবন

উখরা, বর্ধমান-৭১৩৩৬৩

ব্রেনটিউমার, ব্রেস্টটিউমার, ফ্রাইবয়েডইউটেরিয়াস, শ্বেতী, সোরাইসিস্ চর্মরোগ, পেটের রোগ, চুলের রোগ, সুগার, কিডনী রোগ, হাঁপানী, বাত, ব্যথা ও স্ত্রী রোগের স্থায়ী চিকিৎসা।

DR. ARUN B. CHAKRABORTY

B.A.M.S., ***Ayurved Ratna Physician & Botanist***

M/O. ***Patanjali Ayurved Chikitsalaya***

Mobile-9332205341, 9832791541

Anil Kr. Bhalotia

Property Consultant

689, Lake Town, Block - A

Kolkata -700089

(Near Hollywood Dry Cleaner)

Ph : 9330026410 (M)

9339364060 (R)

9230618818 (M)

SREE RAMKRISHNA ENGINEERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

Surajit Sur

Secretary

Mob: 9230613530

Noapara, Barasat, Kolkata-700124.

Land:(033) 033-2524-1780/6458-6957

email: surajit.sur@srecsl.com

Web: www.srecsl.com

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

হরে রাম হরে রাম রাম হরে হরে

বিভাষ রায়

উর্দ্ধবপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে

হরে রাম হরে রাম রাম হরে হরে

পূর্ণচন্দ্র কর

রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর

—আসতে পারি, বলেই গোলক হালদার মাথা চুলকে ঢুকে পড়ে।

—স্যার, গুডমর্নিং। বলছিলুম কি প্যাকেজিং আর লেবেলিং সেকশনে ডেলি ওয়েজে যারা আছে; ওরা স্যার, ফেস্টিভ ইনসেনটিভ চাইছে।

—ওরা চাইছে, না...কতজন আছে? গোলকদা।

—ওই স্যার পনেরো জন।

—তাহলে আপনার ওই হলো পনেরো ইনটু...মানে তিনশো। আর দু'শো করে ধরলে তিন হাজার। ১৫ জন ১ ঘণ্টা করে...ঠিক আছে হয়ে যাবে। ওদেরকে বলুন আজ থেকে ৩০ দিন আধঘণ্টা আগে কাজ শুরু করতে আর আপনি আধঘণ্টা পরে ডিউটি থেকে অফ করবেন।

—ওরা স্যার খুব সেয়ানা। শুনবে না।

—তাহলে আপনার তিনশো টাকাও গেল।

কী যে বলেন? গরিব মানুষ স্যার। আপনার দয়াতেই তো চলছে।

—তিন হাজার যে গলবে, সেটা কী আমি ঘর থেকে দেবো।

—সবই বুঝি স্যার। দুটো ঘরোয়া স্যাম্পল আছে, কথা শুনবে।

—শুনবে! তাহলে পুজোর ডালিতে...

—ঠিক আছে, স্যার।

অরিত্র ক'টা মেল চেক করে। ফাইলগুলোর অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট-এ চোখ বোলায়। দুটো খুব জরুরি চিঠির পয়েন্ট রেডি করে। এমন সময় বাজার বেজে ওঠে,—হ্যাঁ বলছি।

—স্যার ইউনিয়ন লিডার অনিল সাহা দেখা করবেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। পাঠিয়ে দাও।

—স্যার, নমস্কার। এসব কী শুনছি?

—নমস্কার, বসুন। কী শুনছেন?

—আপনি ডেলি ওয়েজদের দু'শো টাকা করে দেবেন, —ওই গোলক হালদারের কথায়। আর কোম্পানির স্টাফেদের দেখলেন না।

—দেখুন, অনিলবাবু। ওরাও তো কোম্পানিরই কাজ করে। ওদের আবদারও তো মেটাতে হবে।

—সে মেটান কোনও অসুবিধা নেই। তাহলে স্টাফেদের বোনাসও পাঁচশো করে বাড়াতে হবে।

—শুনুন অনিলবাবু। স্টাফেদের বোনাস ডিমান্ড নিয়ে আলোচনার জায়গা আমার ঘর নয়। আপনি ইউনিয়নের মিটিং ডাকুন। আমি বোর্ড অফ ডিরেকটার্সকে জানাব। তারপর লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার, অ্যাকাউটেন্ট, আমি, সকলে মিলে বসে ঠিক করা যাবে।

—তাহলে আপনি ওইসব ঠিক করুন। আমরা টিফিনের পর মিটিং করে ম্যানেজমেন্টকে আমাদের ডিমান্ড জানাব। তারপর অফিসে ''গো স্লো'' চালিয়ে যাব।

—আপনি খামোকা বার খেয়ে বিপ্লবী সাজছেন। ওসবের কোনও ভ্যালু নেই। স্টাফেরা বোনাস পাবে, আনন্দের নাড়ু ফ্যামিলিতে ভাগ বাঁটোয়ারা করবে। আপনার কী?

—কী বলতে চাইছেন, আপনি?

—ঠিকই বুঝেছেন। আজ সন্ধেয় একদম ঘরোয়া টাইপ পুজোর ডালিতে সাজিয়ে দেবো। শুধু অঞ্জলি নিয়ে, চরণামৃত ঢেলে পুজো...প্রসাদ করে দেবেন। আপনি ফ্রেশ। দিল খুশ। কয়েকটা রোকরা পকেটে ফুস!—কেমন লাগছে প্যাকেজটা।

—দারুণ স্যার, ঠিক আছে। তাই হবে। তাহলে পরে একটা মিটিং। আসছি স্যার। ফোন করে...

—মিস্‌ড কল যাবে। বেশি হ্যালো হ্যালো করবেন না। টাইম, লোকেশান জেনে নেবেন।

হাসতে হাসতে অনিল সাহা বেড়িয়ে যায়। অরিত্র অফিসেই লাঞ্চটা সেরে নেয়। তারপর কোলাবরেশান আর এক্সপানসান-এর জন্য দুটো টিম-এর সঙ্গে ইমপর্টান্ট মিটিং সেরে ফেলে। মিটিং শেষ হয় বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। লিওন কতকগুলো ড্রাফটে সই করিয়ে নেয়। চিঠি দুটোর প্রিন্ট আউট দেখিয়ে নেয়। অ্যাকাউন্ট আপডেট চেক করায়।

—লিওন, প্লিজ কানেক্ট গোলক হালদার।

—ইয়েস স্যার। ইন্টারকম-এ বোতাম টিপে একটু অপেক্ষা। স্যার হি ইজ অন লাইন। অরিত্র চোখের ইশারায় লিওনকে বেড়িয়ে যেতে বলে।

—হ্যাঁ। গোলকদা। শ্যাম গেস্ট হাউস। ২৩২এর বি দত্তপুকুর রোড, রুম নং ২০১, সব ঠিক তো। এবারে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল যেন ঠিক থাকে। দরকারে আর একটু হাতে গুঁজে দেবেন। লাইনটা কেটে দেয়।

—মোবাইলের সিমটা খোলে। নতুন সিম লাগায়। মিসড্ কল দেয়। একটু পরেই মোবাইলটা বেজে ওঠে—সন্ধে সাড়ে সাতটা। শ্যাম গেস্ট হাউস। ২৩২ এর বি, দত্তপুকুর রোড। রুম নং ২০১, সুশীলা লাইনটা কেটে দেয়। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। সব লক করে। মোবাইল দুটো পকেটে ফেলে। এ. সি.-এর সুইচ অফ করে। লিওনকে বলে অফিস থেকে বেড়োয় অরিত্র।

গাড়ি নিয়ে 'ব্লু হেভেন' ক্লাবে ঢোকে। পুলের পাশে ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু ড্রিংক্স আর স্ন্যাক্স নিয়ে বসে। —আরে অরিত্র যে, অ্যাত চুপচাপ। কী ব্যাপার কোন টেনশন?

—না, মিসেস সিন্‌হা? এই কাজের চাপ, মাথাটা একটু ভার লাগছে।

—ওকে, রিল্যাক্স। সন্ধেয় হালকা লাগবে। বলেই হেসে চোখটা টিপেই চলে যান।

অরিত্র চুপচাপ স্ন্যাক্স আর ড্রিংকস্-এ মন দেয়। অনিল শালা এখন পুজো করছে। তারপর শালা, তোমার লিভারি দেখাব আমি। পার্লারগুলোতে কপি করেই বেচে দিতে হবে। আগের বার ভালো আমদানি হয়েছে। ওতেই খরচা উশুল।

বাড়ি ফিরতে সাড়ে বারোটা। ড্রিংক্স-এর ঠেলায় মাথা ভার। হারু দরজা খুলে দেয়। কিচেনে খাবার ঢাকা দেওয়া।

—দাদা, খাবারটা খেয়ে নিন, ফ্রেশ হয়ে। মাইক্রোতে গরম করব?

—না, না। তুমি যাও। আমি ঠিক আছি।

জুতো দুটে কোনওরকমে খুলে, ব্যাগটা রেখে দেয় মেঝেতে। সোফাতে এলিয়ে পড়ে অরিত্র।

প্রথম প্রথম মিতাশা বই পড়ে। টিভি দেখে, গান শুনে অপেক্ষা করত। এখন আর করে না।

দুদিন ছিল না অরিত্র বাড়িতে। কোনও খবর নেই। মোবাইলে কনট্যাক্ট হচ্ছে না। প্রায়ই জানাচ্ছে সুইচ-অফ। অফিসে ফোন করলে বলছে স্যার, মিটিংয়ে ব্যস্ত, পরে কল করবেন। বাড়িতে মিতাশার দমবন্ধ হয়ে আসছে। কিচ্ছু ভালো লাগে না।

অরিত্র পুরো মদে চুর।

—এটা কী কোনও ভদ্রলোকের বাড়ি? মিতাশা চিৎকার করে।

অরিত্র চমকে ওঠে—কী বলছ কী? সরো। সিনক্রিয়েট কোরো না।

—সিনক্রিয়েট? কোথায় ছিলে? এ্যাত রাত অবধি, —অফিস তো খোলা থাকে না? মিটিংও চলে না।

—যেখানেই থাকি সে কৈফিয়ত কী তোমায় দেবো?

—আরে, সরো, সরো। তখন থেকে দরজা দাঁড়িয়ে খালি পটর-পটর।

—অ্যাত রাতে ডায়লগ চাই না! যে খুলে রেখেছিল তার কাছেই থাক না। বাড়ি এলে কীসের টানে?

---টান? এই বাড়ি, সংসার, সম্পত্তি, চাকর-মালি-ড্রাইভার সবই তো এখানে...

—চুপ করো। ঘর, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল সবই সাজানো— এগুলো দিয়ে কী স্বামী-স্ত্রীর জীবন চলে?

---স্বামীর কোনও দায়িত্ব আমি পালন করিনি। গাড়ি-বাড়ি-ব্যাঙ্ক ব্যালান্স...

—চুপ। একদম বাজে বকবে না।

—তুমি চুপ করো। সরো।

—কোথায় সরবো? সংসারে সরতে সরতে আমি তো এবাড়ির একটা শো-পিস হয়ে আছি।

—তাই থাক। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

—এ্যাতই যদি শান্তির বুলি। বিয়ে করেছিলে কেন?

—আরে, ছাড়ো। তোমার বাবা হাতে পায়ে ধরে কত টাকা দিয়ে আমাকে গেঁথেছে জানো। জানো না। নিমাই বাগচির সাপোর্টে ব্যবসাটা ফ্লারিস করেছে।

—গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে। অ্যাত বছরে বিয়ের পরে ক'দিন ভালোবেসেছো? ক'দিন সিনেমায় গেছো? কোথায় বেড়াতে গেছি? একটা ছোট বাচ্চা দিতে পেরেছ? পুরুষ মানুষ। ছোঃ।

—একদম বাজে বকবে না। ডাক্তারের কথা তুমি মেনে চলেছো?

—তুমি টেস্ট করিয়েছ? ডাক্তারের ইনডিকেশান কী ছিল?

—তুমি আসলে নপুংসক।

—কী এ্যাত বড়ো কথা! মারের জন্য হাতট উঠে যায়—বাঁজা একটা...কোত্থেকে এসেছে...সিঁড়িতে নেমে আসেন অমৃতা মিত্র।

—অরিত্র, কী করছিস? মাঝ রাতে? মিতাশা, এটা যাত্রা করার জায়গা নয়, যাত্রার জন্য অনেক জায়গা...

মিতাশা কেঁদে ফেলে—মা, আমাকে এই অপমানও শুনতে হল।....

—তুমিও তো আমার ছেলেকে যা-নয়-তাই বলছিলে।

—আপনিও তো মা। আমার কী মা হওয়ার সাধ হয় না।

—অনেক জীবন পড়ে আছে। মাঝরাত্তিরে, সকলের ঘুম নষ্ট করে দাবি পেশ?

—মা, তুমি উপরে যাও।

—হ্যাঁ, মা। আপনিও তো ব্যবসার লাভ ক্ষতি বোঝেন। আমার লাভটা যদি একটু বুঝিয়ে দিতেন।

—এটা বুঝে নিতে হয়। অমৃতা গটমট করে উপরের শোওয়ার ঘরে চলে যান। অরিত্র দড়াম করে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দেয়। ড্রয়িং রুমে একা মিতাশা দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে কাঁদে। সাজানো গোছানো ঘরের মাঝে একটা অবয়বের উপস্থিতি জৈবিক তৃষ্ণায় অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে।

অমৃতা মিত্র। অরিত্র'র মা। একটা হ্যান্ডিক্রাফট্স-এর বুটিক আর ডিজাইনার ড্রেস মেটেরিয়ালস্ ফ্যাসন-হাব চালান। বাবা চয়ন মিত্র সরকারি অফিসার। সরকারি সোর্স কাজে লাগিয়ে মা ও ছেলে বকলমে ব্যবসা চালায়। অমৃতা খুব স্মার্ট মহিলা। নানা গ্রামে-শহরতলিতে ঘুরে ছোটখাটো সেন্টারে যোগাযোগ রাখেন। প্রোডাক্ট পারচেজ করেন। এইসব কাজে সব সময়ই

তার সঙ্গে থাকে কোনও পুরুষ পার্টনার। তার সার্কেলটা আরও বড়ো করতে চান। স্বপ্ন দেখেন দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিদেশেও তার জিনিসের কদর আছে। একটা কোম্পানির অ্যানুয়াল ফাংশান ও পার্টির ভেনু ডেকরেশন- এর দায়িত্ব নেয় অমৃতা। মনের মতো করে ডিসপ্লে ও ডিজাইন ব্যালান্স রেখে এক অসাধারণ পরিবেশ তৈরি করেন। সময় মতো মিটিং, বক্তৃতা, কালচারাল ফাংশান সব মিটে যায়। তারপর মিউজিকের সঙ্গে শুরু হয় পার্টির দাপাদাপি আর হুল্লোড়।

বয়স্কা অমৃতা কয়েকজন স্টাফকে সঙ্গে নিয়ে একপাশে বসেছিলেন। অভ্র আলাপ করিয়ে দেয়, সৌরক বসুর সঙ্গে। বিশেষ কোনও কথা হয় না। শুধুই সৌজন্য বিনিময়। সকাল থেকে পরিশ্রম চলছে। সব সাজানো, তদারকি। ঠিকমতো খাওয়া হয়নি। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায় অমৃতার। সৌরক সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে। সময় নষ্ট না করে, ওই নয়েজ সার্কেলের বাইরে এনে শুইয়ে দেয়। ওর একজন স্টাফকে অভ্রর মারফত ডাকে। ওরা সবাই ম্যাডামের এই অবস্থা দেখে হকচকিয়ে যায়। সৌরক ওঁর বাড়ির লোকেশানটা নেয়। অভ্রকে বলে—ওদের সঙ্গে থেকো। সব ব্যাক-আপ করিয়ে দিও। হয়ে গেল আমাকে একটা খবর দেবে।

—ওকে, দাদা। তুমি চিন্তা করো না। আমি ম্যানেজ করে নেবো। ঢুকেই চমকে ওঠে। সোফার পেছনে মিতাশা দাঁড়িয়ে। মিতাশাও ওর দিকে তাকিয়ে চমকায়। কিন্তু হাজার হোক বাড়ির বউ, তাই সামলে নেয়। স্মৃতি এখন সাদাকালোয় মাখামাখি, সেই লাল সিঁড়ি ভেঙে দোতলার ঘর, সেই গোলাপি দেওয়াল, সবুজ বারান্দা, সেই রঙের জানালা। সেই শক্ত শোফায় মিতাশা বসে, বেড়ানোর গল্পে কী প্রাণোচ্ছল।

—সৌরক চল। যাওয়া যাক। ওনাদের সব বুঝিয়ে দিয়েছি। পরে একদিন এসে দেখে যাব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলুন। ওষুধ কী কিছু আনতে হবে?

—আপাতত আজ রাতের—আমি করে দিয়েছি। কাল থেকে আনিয়ে নেবেন।

কোনওরকম ফর্মাল বিদায় না জানিয়েই সৌরক আর ইন্দ্রাশিস বেরিয়ে যায়। মিতাশা একদৃষ্টিতে দেখতে থাকে আর মনে পড়ে যায় বাবার কথা— জেদি, একরোখা। অত টাকা থাকা সত্ত্বেও একটা হীরের আংটির বদলে এই বাঁদরের সংসারে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বিয়েতে বসার সময় বাবা ধার করে ক্যাশ এনে জামাইয়ের দানপাত্রে রাখেন। দেরি হয়েছে বলে কী গণ্ডগোল! কত কী কথা? বাবা একেবারে হাত জোড় করে, ক্ষমা চেয়ে শেষে উৎরে দিল—কোথায়?—একটা এঁদোপুকুরে গলায় কলসি বেঁধে।

দু'দিনের মধ্যে বাঁকুড়ার কাছে, একটা প্রজেক্ট-এর তদারকিতে সৌরক যায়। পথের ধারে এঁদোপুকুরে শালুক ফুল ফুটে আছে। লালচে বেগুনি রঙ, অভ্র ক্যামেরা ম্যান নিয়ে রেডি। সৌরকের পরামর্শ মতো স্টিল ছবি তুলে, খানিকটা ভিডিও ক্লিপিংস রাখা হয়। সৌরকের বেশ জ্বর হয়। বাড়িতে ফিরেই ডাক্তারের পরামর্শে জ্বর নিয়েই 'পজিটিভ ডায়াগনস্টিক সেন্টার'-এ রক্ত পরীক্ষার জন্য যায়। অভ্র সঙ্গে ছিল। মৃদুলও আসে। ডাঃ চ্যাটার্জি আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

—কে সৌরক বোস? কোথায় তিনি? বলে হুড়োহুড়ি লেগে যায়।

সৌরক আরও আড়ষ্ট হয়ে যায়। ব্লাড কালেকশানের ইয়ং সিস্টারটি অনুযোগের সুরে বলে —আপনি এখানে বসে কেন? ভেতরে চলুন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলুন।

কালেকশান রুমে হঠাৎ সৌরক মিতাশাকে দেখতে পায়।

—কী ভালো তো? মা এখন ভালো আছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার আবার কী হলো?

—ঐ একটু জ্বর। তাই একটু রক্ত পরীক্ষা।

সিস্টার গম্ভীরভাবে বলে —এখনকার জ্বর। কী থেকে কী হয়? টেস্ট করানোই উচিত।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সৌরকের সব মিটে যায়। অভ্র আর মৃদুলকে নিয়ে সোজা ডাক্তারের চেম্বার। দু চার কথা বলেই বাড়ি। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।

—আচ্ছা মিতাশার কী হলো? ওর আবার কী রোগ? ওঃ! বাঃ! কী সব ভাবছি? ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে। নিশ্চয় বাচ্চা হবে। তাহলে ওর সঙ্গে বর নেই কেন? ধুস কী সব ছাইপাঁশ ভাবছি। দেখি বাঁকুড়ার প্রজেক্টটা কীরকম সাজালো? — মোবাইলটা নিয়ে একটা ফোন করে।

মিতাশার কাছে মনে হয়, যেন একটা মেসবাড়িতে আছে। শ্বশুর-শাশুড়ি নিজের মত আসেন, বসেন, খাওয়া-দাওয়া করেন। অরিত্র কোনদিনই এমনকী ছুটির দিনেও দুপুরে কিছু খায় না। এখন রাতেও খায় না। বাড়ি ফেরার কোন ঠিক সময়ই নেই। ডাক্তার মিতাশার থাইরয়েড টেস্ট লিখেছিল। তার রিপোর্টও নর্মাল। অরিত্রের কাজের কোনো হদিশই পায় না মিতাশা। ছোটখাটো ঝগড়া অশান্তিও শুধু বকবক বাড়ায়। অসহ্য চিন্তায় অস্থির হয়ে মিতাশা একদিন দুপুরে অরিত্রের অফিসে যায়। অরিত্রের সঙ্গে দেখা হয় না। অফিসের কোনো স্টাফ কিছুই বলতে পারে না। নিজের গাড়ি ছেড়ে দেয়। আনমনে হাঁটতে থাকে। ফুটপাতে কত কী পশরা বিক্রি হচ্ছে। বড়ো বড়ো দোকানের শো-উইনডো দেখে – কী ভালো লাগে। একটু দাঁড়ায়। কাঁচে নিজের অবয়বটা দেখে। আবার এগোয় সামনের দিকে। হঠাৎই কী মনে করে রাস্তায় নেমে পড়ে।

HALDER ART FLOOR

ইন্টেরিয়র ডেকরেটিং এবং অভিজ্ঞ মিস্ত্রী দ্বারা মার্বেল মোজাইক টাইলস্, হেরিটেজ এবং পেন্টিং-এর কাজ যত্ন সহকারে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে করে থাকি।

চৌধুরীপাড়া রোড, নতুন পুকুর,
বারাসত, উত্তর ২৪ পরগণা
যোগাযোগ : অসীম হালদার
ফোন : ৯৮৩০২৬০৭৩১, ৯৮৩৬৮৫২৬৯৭

আপনার ঘর ভরে উঠুক সমৃদ্ধিতে

Steel এর আলমারী, সোকেস, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি সকল প্রকার **Furniture** এর জন্য আসুন আমাদের কাছে।

Steel n Style
A furniture brand from TATA Steelium

শুভেচ্ছাসহ

GURUNATH FURNITURE
Distibuture–Steel n Style
42/8 Rathtala, Jessore Road (s)
Barasat-700124
Mobile-9830614749, 9038474989

নিজের দেশকে অতি সামান্যই দিচ্ছি, তাই নিজের দেশকে পাচ্ছি না

বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়াইয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অদি সামান্যই দিতেছি, সেজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব, একথা যে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে দুঃখ দিই, অপমান করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না—সেইজন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের আকস্মিক কারণ হইতে নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কালান্তর—'স্বাধিকার প্রমত্তঃ'

---WELL WISHER

ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই,

সকল ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্টদের জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

WANTED DISTRIBUTOR

ময়লার চরম শত্রু কাপড়ের পরম বন্ধু

গ্লোবাল ফাইটার

ডিটারজেন্ট পাউডার

প্রতিনিধিবিহীন এলাকায় ডিস্ট্রিবিউটরের জন্য

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

মোবাইল নং-০৩৩-৩২৬১০৩৪৫, ৯৬৮১৬০০৯৭৫

হুশ্-হাস্ করে পাস করা গাড়িগুলোর মাঝে দিশাহারা হয়ে পড়ে। খ্যাঁচ করে সবুজ রঙের একটা শেভ্রোলে স্পার্ক ওর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে। মিতাশা চমকে যায়। গাড়ি থেকে একজন আধুনিকা নেমে ইংরাজি-বাংলায় যাচ্ছেতাই বলতে গিয়ে থেমে যায় ---- আরে তুই! বলেই জড়িয়ে ধরে। চারদিকে গাড়ির প্যাঁ-পোঁ, ভোঁ-ভ্যাঁ – হর্নের সোরগোল। এর মাঝেই মিতাশাকে বগলদাবা করে ওর ছোটবেলার বন্ধু ঈশিতা গাড়িতে তোলে। গাড়িতে মিতাশা খুব জড়োসড়ো আর আড়ষ্ট হয়ে বসে।

—জানিস, আমি ইন্টিরিয়র ডেকরেশান-এর কোর্স করে, এখন একটা ফার্ম চালাই। কত দিনের পর দেখা হল বল্। মনে হয় কুড়ি-পঁচিশ বছর হবে। কী বল্? গত বছর গাড়িটা নিয়েছি। দিল্লীতে দুটো প্রজেক্ট করেছিলাম। যা কামিয়েছি না। গাড়িটা হয়ে গেল। জানিস একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছি। কত তলার উপর গেস্ কর। গেস্ কর। পারলি না তো। পঁচিশ তলায়.....

—গাড়ি চালাতে চালাতে মানুষ এ্যাত বকতে পারে – মিতাশা ভাবে আর নিজেকে আরও গুটিয়ে নেয়।

—কীরে ইয়ার! কুছ তো বোল...

—কী আর বলবো? গ্র্যাজুয়েশান করলাম। নাচটা কন্টিনিউ করতে পারি নি। বিয়ে করেছি। ব্যস, সংসার...

—এ্যাই! তোদের ঐ মিয়োনো মুড়ি আর ঠাণ্ডা চপের গল্প। কতদিন আর ঘাঁটবি? প্রথমে বরের তারপর ছেলেমেয়ের তারপর অথর্ব শ্বশুর শাশুড়ির। তারপর দেখবি তুই একটা জবুথবু কুঁজো বুড়ি হয়ে গেছিস। তোকে ঘাঁটার কেউ নেই। তখন শালা ওল্ড-এজ-হোম। তবে তার আগে ছেলে-বউ; মেয়ে-জামাই সব চেটেপুটে সর-ননী-মিঠাই সাবড়ে দেবে।

—চল্ তোকে একটা চার্জার স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছি। একটু চার্জ লাগবে।

—আমার কাছে মোবাইল নেই। চার্জারও নেই।

—এ চার্জ, সে চার্জ নয় সখী। চলো না, অনেক তো সংসার কেলিয়েছো। এবারে একটু ---- চোখের ইশারায় ভ্রূটা অদ্ভুত নাচায়।

ভরদুপুরে ‘হিডেন হিট’ নামের একটি ক্লাবে হাজির হয়। মাঝে একটা তারকাকৃতি পুল। চারপাশে গোল টেবিল আর দুটো করে চেয়ার। বাউন্সাররা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবাইকে মাপছে। ঈশিতা চিকেন প্যাটিস আর কোক নিয়ে বসে পড়ে। মিতাশা আগে এখানে এসেছে কী না, কোন কোন ক্লাবে গেছে, গাড়ি চালানো জানে কীনা, বরের সঙ্গে কোথায় কোথায় গেছে ... সব প্রশ্নেরই মিতাশা চালাকি করে উত্তর এড়িয়ে যায়। দুজনেই যেন কিছু একটা খোঁজে। ঈশিতার মুখটা কিছু একটা দেখে খুশিতে ভরে যায়। মিতাশাকে ওয়েট করতে বলে ঈশিতা টেবিল ছেড়ে উঠে যায়। একটু দূরের দিকে একটা থামের পাশে একজন সুবেশিত পুরুষ, ছোট ল্যাপটপে কিছু কাজ করছিল। ঈশিতা একগাল হেসে, দু চারটে মন্তব্য করেই সামনের চেয়ারে বসে পড়ে।

—তারপর অরিত্র, অনেকদিন পর। কী খবর?

—কী আবার খবর? যেমন চলছিল, চলছে।

—সন্ধের পর কী প্রোগ্রাম?

—নাথিং সো ইমপর্টান্ট ....

—দেন কাম টু মাই প্লেস। উই উইল শেয়ার সাম মোমেন্টস্...

অনেকদিন আড্ডা হয়নি জমিয়ে...

—জমিয়ে খেলাও হয়নি....

—আরে ইয়ার। ইউ আর এ ভেরি স্পেশাল সেফ গাই টু প্লে।

মিতাশা একা একা বোর ফিল করে। এদিক ওদিক তাকায়। ওর পেছনদিকে ঈশিতা যে কোনো টেবিলে গেছে। হঠাৎই ক্লাবে আসে সৌরক। মিতাশার মুখটা হাসিতে উচ্ছল। সৌরক এদিক ওদিক তাকিয়ে ফাঁকা টেবিল পায় না। মিতাশা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সৌরক দেখতে পায়, – আরে! তুমি এখানে? কী ব্যাপার? সৌরকের ‘তুমি’ ডাকে মিতাশার ভেতর অবধি একটা ঝিন্ ঝিন্ ভাব যেন নাড়িয়ে দেয়।

—সব বলছি। চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি। ইশারায় বেয়ারাকে ডাকে।

—আমার সঙ্গে যে ম্যাডাম ছিল, তাকে দেখেছেন?

—ঐ ওদিকে ছিলেন দেখেছি।

—যাই হোক। আপনি বিলের টাকাটা নিয়ে নিন। ম্যাডাম এলে, বলে দেবেন। টিপস্ পেয়ে বেয়ারা খুশি হয়।

সৌরক এসেছিল অফিস থেকে একটু রিলাক্স করতে। এসে একেবারে মজায় কাত। মিতাশা ভাবে সৌরকের সঙ্গে এখানে বসা সেফ হবে না।

দুজনেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। সৌরকের গাড়িতে যেতে যেতে মিতাশা একাই বকতে থাকে – আমার ছোট্ট বেলার বন্ধু ঈশিতা। এখন ইন্টিরিয়র ডেকরেটার। নিজেই গাড়ি চালাতে পারে। একটা ফার্মও চালায়। ঐ আমাকে এখানে নিয়ে এল, – এনজয় করতে, – তারপর নিজেই কোথায় পালিয়ে গেল? – কে জানে। যাহোক তোমার শরীর এখন ভালো তো।

সৌরক মাঝেই বলে – কোথায় যাবো?

—কোথায় আর যাবে? আমার শ্বশুরবাড়ি। একটু আড্ডা হবে। ওফ্! কদ্দিন গল্প করিনি।

মিতাশা ভাবে সেই সান্দাকফু, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, ভিতরকণিকা, পুরী – কত বেড়ানোর গল্প। সব শোনাই তো

হয়নি। সৌরকের মনে তখন প্রিয় খাবারের কথা। গরমাগরম চাইনিজ বা মোগলাই। বাড়িতে এই দুপুরে এইসব হুজ্জুতি কী হবে? দরোয়ান গেট খুলে দেয়। হারু দরজা খোলে। শুনশান বাড়িতে এখন শুধু দুজন সৌরক আর মিতাশা। সৌরক মনে মনে মিতাশাকে প্রাণভরে আদর করে আর মিতাশা ভাবে সে সৌরকের আদরে আস্তে আস্তে তেতে উঠছে।

—আরে দাঁড়িয়ে কেন? বসো। —একটু অপেক্ষা করো, আসছি। বলেই মিতাশা ভেতরে চলে যায়। সৌরক ভ্যাবলার মত ফাঁকা ঘরে শোপিস, ছবি, গাছ —এসব দেখে। একটা ট্রে-তে গরমাগরম পকোড়া আর কফি নিয়ে আসে মিতাশা। সকালে বানিয়েছিলাম। কিছুটা রেখেছিলাম বিকালের জন্য।

—ভগবান কার টিফিন কোথায় লেখেন? —বলেই সৌরক হেসে ওঠে।

মিতাশাও খুশিতে হাসে। কফিতে চুমুক আর পকোড়ায় কামড় —প্রশংসা আর থামেই না সৌরকের।

—হয়েছে, হয়েছে। অত বলতে হবে না। তোমার ঐ ভগবানকে বলো, আবার কবে টিফিন খাবে? আমি এর থেকে ভালো স্ন্যাক্স খাওয়াবো। চলো, ওপরে যাওয়া যাক্।

সৌরকের কেমন যেন ভয় ভয় করে। পা-টা যেন কে টেনে ধরে? ফাঁকা বাড়ি। অন্যের বউ। হাজার পরিচিত হোক। ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক, বন্ধুত্ব কিছুই নেই। লীনা, শীলার সব মুখগুলো মনে পড়ে যায়।

—আরে কী হলো? চলো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলো। মিতাশা আগে যায়। সৌরক সঙ্কোচে সন্তর্পণে পেছনে পেছনে যায়। একেবারে বেডরুমে বসায়। সৌরক বেশ অস্বস্তিতে ঘামতে থাকে।

—কী গরম লাগছে? —দাঁড়াও এ.সি.-টা চালিয়ে দিই। কদিন যা গরম পড়েছে না।

সৌরক খালি এদিক ওদিক দেখে। যদি কেউ আসে পালাতে হবে। জানলাতো সব বন্ধ। শুধু দরজাটা খোলা। আবার শাশুড়ি ভালো করে চেনে। বউয়ের সঙ্গে দুপুরে বেডরুমে। যা কেলান কেলাবে না — আবার জ্বর না এসে যায়। কে বলেছিল, দুপুরে রিলাক্স করতে ক্লাবে যেতে? পুরোনো প্রেম একেবারে উতলে উঠছে। দুদিন তো দেখেছো — গল্প করেছো। এখন ঠ্যালা সামলাও। মিতাশা ঘটাং করে দরজা বন্ধ করে দেয়। সৌরক ভয়ে সন্ত্রস্ত। একবার বাথরুম গেলে ভালো হয়।

—কী হলো? উঠলে কেন?

—না, বাথরুমটা?

—ওঃ! বাথরুম যাবে। ঐ ডানদিকে ড্রেসিং টেবিলের পাশে।

বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দু গালে দুটো চড় কষায়। কলটা খুলে দেয়। ভেউ ভেউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। দরজায় নক করে মিতাশা, —কী হলো? শরীর খারাপ লাগছে?

—ঘটাং করে, দরজা খুলে সৌরক বেরিয়ে আসে।

তারপর বিছানায় গা এলিয়ে মিতাশা একে একে সৌরকের সব খবর জেনে নেয়। মায়ের মৃত্যুসংবাদে খুব দুঃখ পায়। এখনও বিয়ে হয়নি, শুনে নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। আর বাবা জীবনের সব থেকে বড় ভিলেন, মনে হয়। বাবার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখা যাবে না। ব্যবসার ব্যস্ততায়, বেড়ানো, ছবি তোলা সবের মাঝে ওকে মনে রেখেছে ভাবতেই মিতাশার বুকটা যেন ভালোলাগার ছোঁয়া পায়। সৌরক এবার আড্ডার ছলে মিতাশার জীবনের শুধু দুঃখের, কষ্টের আর অপমানের উল্লেখ শুনে — নিজের মধ্যে কেমন যেন একটা অপরাধবোধ জাগে। আত্মীয়দের বয়কটটা যে যথাযথ, তা মায়ের শ্রাদ্ধের সময় বুঝিয়ে দিয়েছে।

—একটা ফোন কল আসে। মিতাশা হ্যাঁ আর হুঁ বলে ছেড়ে দেয়।

—ম্যাডাম দুজন গেস্টকে নিয়ে আসছেন। বিজনেস মিটিং...

—মানে, অমৃতা মিত্র। মিটিং বাড়িতে কেন?

—এরকমই এ বাড়িতে হয়। দুজন গেস্ট মানে দুজন প্রাইভেট সেক্রেটারিও আসবে।

—ওকে; আজ তাহলে উঠি। মিতাশা দরজা খুলে দাঁড়ায়।

—আবার আসবে তো? –সিওর, সিওর, বলে – সৌরক গাড়ি নিয়ে ধাঁ।

মিতাশা হারুকে সব রেডি করতে বলে। ওপরের ঘরে টি.ভি. চালিয়ে দেয়। আধঘণ্টা পরে অমৃতা দুজন গেস্ট আর বুটিকের দুজন মহিলাকে নিয়ে হাজির হয়। ওপরের আলাদা ঘরে ড্রিংকস্, চিকেন পকোড়া, চিকেন কষা, ফ্রায়েড রাইস, মিষ্টি সব থার্মোওয়ার বোল-এ সাজানো থাকে। চাপা কথাবার্তা, আলোচনা চলে। তারপর হুল্লোড়, অমৃতা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। দরজা বন্ধ হয়। ঘণ্টাখানেক পরে খোলে। আরও কিছুক্ষণ পরে অমৃতা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢোকেন। দুটো বিছানাই বিধ্বস্ত। চোখের ইশারায় মেয়েরা বলে —সব ঠিক আছে। অসংলগ্ন জামা কাপড় সামলে দুজন সরকারি পারচেজ অফিসার কনট্রাক্ট সাইন করেন। কলকাতায় যে 'সোনার বাঙলা মেলা' হবে, তাতে স্টল, ডিসপ্লে আর প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য বিরাট অর্ডার।

—মিসেস মিত্র, উই আর কোয়ায়েট হ্যাপি, দ্য ট্রীট ইউ হ্যাভ গিভেন টু আস। ইফ পসিবল্ বিফোর দ্য ফাইনাল পেমেন্ট; উই ওয়ান্ট টু এনজয় দিস হোমলি কম্পানি ওয়ানস্ এগেন।

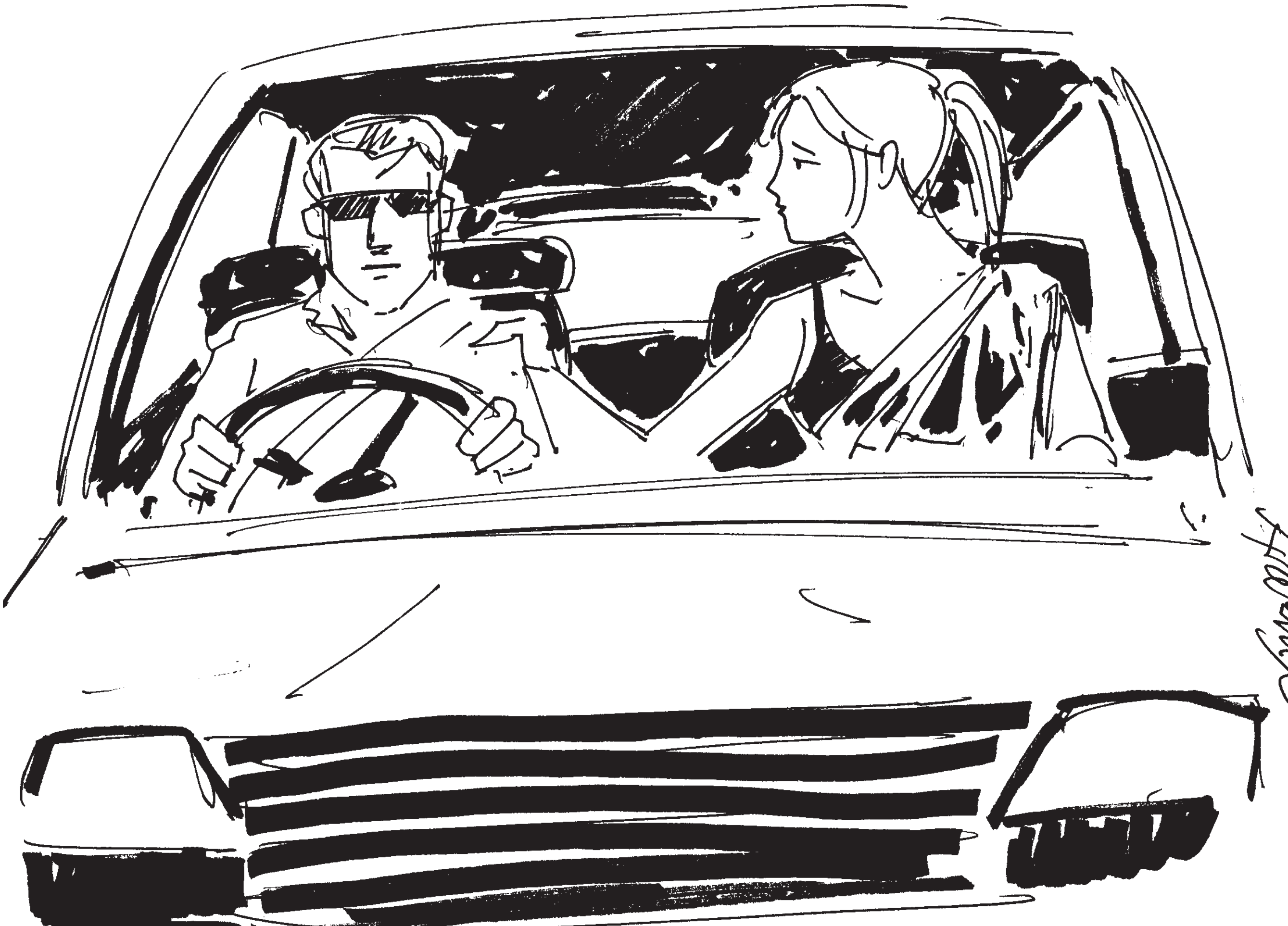

ঘরের ভেতর থেকে গার্গী আর মিলি বলে —বুড়ো ভাম আবার আসবে? দিদিকে বলে এবার রেড ডে-এর পাঁচদিনের সময় আসতে বলবো। বুঝবে শালা টেস্ট কারে কয়।

অমৃতা মিত্র কাজটা নামানোর জন্য ফোনে টুকটাক কথা সেরে নেয়। তারপর প্ল্যান-ডিসপ্লের ব্যাপারে ওর ইউনিটের সুধীরবাবু সৌরকের কথা বলে। যেদিন অমৃতা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তখনই অভ্রর কাছ থেকে সৌরকের সম্পর্কে অনেক কিছু আলোচনা সুধীরবাবু টাইম পাশ করতে শুনে নেন। সঙ্গে সঙ্গে অমৃতা হাজির হয় সৌরকের অফিসে। সেক্রেটারি বসতে বলেন। জানিয়ে দেন—একটা মিটিং চলছে প্লিজ, একটু ওয়েট করুন। ট্রে তে মিনারেল ওয়াটার, চা-এর সরঞ্জাম চলে আসে। মেয়েটি সুন্দরভাবে চা রেডি করে — 'এনজয় ইট' বলে ম্যাগাজিন ট্রলিটা কাছে নিয়ে আসে। পাক্কা এক ঘন্টা পরে মিটিং শেষ হয়। মেয়েটি ইন্টারকমে কিছু বলে। তারপর উঠে আসে, —ম্যাডাম, প্লিজ। আপনি যান। সরি ফর দ্য ওয়েটিং।

অমৃতা বোঝে অফিসের এই আদবকায়দাই ব্যবসায় উন্নতির চাবিকাঠি। দরজা খুলতেই —আরে আপনি! সৌরক উঠে দাঁড়ায়, —কখন এসেছেন? সরি, আমার মিটিংটা চলছিল। বসুন, বসুন। শরীর এখন ঠিক তো। ওষুধ খাচ্ছেন। বেশি দৌড়ঝাঁপ একদম করবেন না।

—হয়েছে, হয়েছে। বাবা, বাবা। অত খবরদারি করতে হবে না। তুমি বসো।

'সোনার বাঙলা মেলা' সম্পর্কে আলোচনায় সৌরক ট্যারিফ কার্ড, বুকিং ফর্ম, নো অবজেকশান সার্টিফিকেট, পুলিশ রিপোর্ট, কোম্পানি টার্নওভার, ট্যাক্স রিসিট —সব ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার কথা বলে। বুকিং-এর সঙ্গে থারটি পারসেন্ট অ্যাডভান্সের কথাও বলে দেয়। মৌখিক কথা হয়।

—সৌরক একদিন আমার বাড়িতে এসো। সেদিন এলে বিপদের মাঝে। কিছুই আপ্যায়ন করতে পারিনি।

—ছিঃ, ছিঃ। কী কথা বলছেন?

—না, না। একদিন এসো। এসব টাকা—কনট্রাক্ট পরে ফাইনাল হবে। আমি এমন ব্যবস্থা করব না, তুমি ভুলতে পারবে না।

—দেখুন, নিশ্চয় যাব। কাজের জন্য কখন কোথায় থাকি, ঠিক নেই তো। আর মেলার ব্যাপার বুঝতেই পারছেন, চাপ

Also Manufacturing Premium Apparels & Clothing

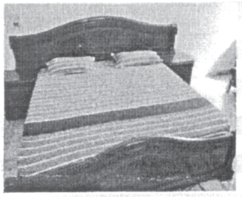

LAKRA INDUSTRIES LTD.

E-200-01, Phase - IV, Focal Point, Ludhiana - 141 010 (Pb.) India
Ph. : +91 161 4696969, 4696900, Fax : +91 161-2670263
E-mail : lakra@lakragroup.com, Website : www.Lakragroup.com

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

Manufacters & Exporters

AIMEX BRAND ALLEN BOLTS, GRUB SCREWS, ALLEN SCREWS &CYCLE PARTS

B-6, Textile Colony, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, Fax : 91-161-5013390
e-mail : annopam_met@hotmail.com

আছে। তাই দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অফিসে এসে সেলস্ অফিসার কমল দত্তর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন। আচ্ছা নমস্কার, আমাকে একটু বেরোতে হবে, —বলেই উঠে পড়ে। অমৃতা বাধ্য হয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ডিজাইন, ডিসপ্লে, লে আউট, কালার সেটিং-এ ব্যস্ত বিশাল ফ্লোরে সৌরক সব দেখাশোনা করে। লোগো, ক্যাপসান, স্লোগান সব লেখাগুলো নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা হয়। কমপিউটারে অটো ক্যাডে স্টলের 'থ্রি-ডি' ছবি দেখে, পরামর্শ দিয়ে; – সাইটে বেড়িয়ে যায়।

বিশাল মাঠে মেলার আয়োজন। সৌরকের দায়িত্বে থাকা স্টলগুলোর প্ল্যান, লে আউটের কাগজ দেখে ফাইনাল সেটিং-এর জন্য সুপারভাইসার, মিস্ত্রী, হেল্পার –সবাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্সট্রাকসান দেয়।

একজন প্যান্ট-সার্ট পরা ও অন্যজন শালোয়ার কামিজে স্মার্ট মহিলা একটা স্টল কনস্ট্রাকসান ব্যাপারে ও সেটিং-এর জন্য একজন ডিজাইন অফিসারের সঙ্গে তর্ক শুরু করে দেন। সৌরক কাছে এগিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেয়। শান্তভাবে ছোট একটা প্যাডের কাগজে প্রয়োজনীয় ভুল শুধরে নেয় ও ফাইনাল সেট-আপের পরামর্শ দেয়। মহিলারা খুব খুশি। —স্যার, আপনি এলে মাঝে মাঝে একটু হেল্প হয়। ফ্লোর থেকে ডিজাইন সরাসরি চলে আসছে।

—আচ্ছা, ঠিক আছে, চালিয়ে যান। আমি দেখছি। আপনাদের যদি বিশেষ কিছু বলার থাকে, প্লিজ অফিসে ইনফর্ম করবেন। এখানে লে-আউট চেঞ্জের কোন প্রভিশন রাখা হয়নি। বাই দ্য ওয়ে, আমি সৌরক বোস। মেলার কয়েকটি স্টলের ডিজাইনের দায়িত্বে আছি।

—আমি পামেলা ডি.সুজা ফ্যাসান ডিজাইনার আর ও রাশি প্যাটেল মডেল ও সেলিং কো অর্ডিনেটর।

অ্যাত বড়ো প্রজেক্ট দেখে পামেলার লোভের জিভটা সতেজ হয়। একটা ভিজিটিং কার্ড চেয়ে নেয়। সৌরক ভদ্রতা করে রাশিকেও একটা কার্ড দেয়। দিন দুয়েক পরে, পামেলা সন্ধ্যেয় সৌরককে ডিনারের নেমন্তন্ন করে ফ্ল্যাটে আসতে বলে। দু কামরার ছোট ফ্ল্যাট। মর্টন স্ট্রীটে। তিন তলায়। বেশ পুরোনো বিল্ডিং। সিঁড়ির মোজাইক নোংরা। বহু বছর রঙ হয়নি। মাকড়সার জাল, ধুলোয় সব মলিন। হলদেটে বালবের আলো। কালচে প্লাইবোর্ডের দরজা ঠেলে সৌরক ঢোকে। বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাইবোন, সবাই টি.ভি. দেখতে ব্যস্ত। পামেলা সৌরককে ওর বেডরুমে বসায়। কফি, স্ন্যাকস্-এর পর কয়েকটা ফ্যাসন ম্যাগাজিন দেখায়। বিদেশী কনট্রাক্ট, হেভি কমিশন, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটাস, —সৌরকের এই ফার্মকেই আরও বিখ্যাত করে তুলবে, বকবকানিতে সৌরকের মাথায় কিছুই ঢোকে না; উদাসভাবে বসে থাকে।

—তুমি আমার ডিজাইনের স্যাম্পল্ দেখবে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

দরজাটা বন্ধ করে। সৌরক চমকে ওঠে। একটা হালকা মিউজিকের মুর্চ্ছনায় ঘরটা ভরে যায়। খাটের ধারে কাঠের ব্লাইন্ডের ওপাশে পামেলা ড্রেস চেঞ্জ করে। সাটিনের অদ্ভুত টু-পিস পাটিয়ালা, ফিতে আর টুকরো কাপড়ের ফুল দিয়ে মোড়া দেহটাকে সৌরকের সামনে নিয়ে আসে। আবার ব্লাইন্ডের ধারে চেঞ্জ করে ব্রাসোর গাউন আর নেটের টপস্-এ আসে। এবার বিকিনি আউটফিটে সৌরকের পাশেই বিছানায় পোজ দেয়।

—এগুলো সবই একেবারে লেটেস্ট। নেক্সট্ সামার কালেকশানে যাবে। কেমন লাগছে? —বলেই সৌরকের গা ঘেঁষে আসে। সৌরক উঠে পড়ে।

—আমি সব ডিজাইনে হেল্প করবো, নতুন মডেল লঞ্চ করবো, শো হবে। তারপর কনট্রাক্ট। কত ফেমাস হবে কনসার্ন...

সৌরকের মোবাইল বেজে ওঠে। দাঁড়িয়েই কথাবার্তা হয়। –হ্যাঁ, আমি আসছি। জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার...

—আরে, মানে। হোয়াট ডু ইউ মিন? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ডিনার...

—প্লিজ, সরি ফর দ্য বিজনেস কল। থ্যাঙ্কস্ ফর দ্য অফার। গুডনাইট,–বলেই বেড়িয়ে যায়।

সৌরক পরের দিনই বিজনেস পার্টনার, ফাইনান্সার, লিগ্যাল অ্যাডভাইসার, ম্যানেজারদের নিয়ে ভিসুয়ালাইজিং এজেন্সী থেকে ফ্যাসনে বিজনেস সুইচ ওভার সম্পর্কে লম্বা মিটিং করে। নানা ডেটা আপডেট করে। প্রত্যেকে একটা বিষয়ে সহমত হয় যে রিটার্ন-এ কোন গ্যারান্টি নেই। আর বিজনেস কনট্রাক্ট, কোয়ালিটি কন্ট্রোলে ফেল করলেই লস-এর রিস্ক ফ্যাক্টর সাংঘাতিক। কনট্রাক্ট ভল্যুম অনুযায়ী প্রোডাক্ট রেডি করতে অভিজ্ঞ ওয়ার্কার, মেসিনপত্র, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, প্রোডাকসান ফ্লোর, রেডি মডেল (লাইভ আর পি.ভি.সি) সব রাখলেও সারা বছরে হয়তো তিনমাস কাজ থাকবে। বাকি নয় মাস মাইনে - মেনটেনেন্স-এ লাভের গুড় গলে যাবে। তাছাড়া ডিজাইনার থেকে শপ ফ্লোর পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রতি স্তরে কমিশন। এ ব্যাপারে সৌরক ডিসিশন নেয়, কোনরকম এক্সপ্যানসন নয়। তবে মনে মনে ভাবে – খেলতে হবে একটু। অনেকদিন ব্যাটিং করা হয়নি। এই গোয়ানিজ পীচে কেমন এই বয়সে সুইং করে দেখতে হবে।

সৌরক একদিন পুলিশের কয়েকজন কর্তা আর কিছু হাই প্রোফাইল বিজনেস ম্যাগনেটদের,—স্টার হোটেলে একটা

মিটিং এর ডেট ফিক্স করতে যায়। সব কথাবার্তা মিটিয়ে একটু ঘুরে দেখে হোটেলের লবি, লাউঞ্জ, গার্ডেন, বার, স্ন্যাকস্ কাউন্টার আর কফি শপ। হঠাৎই রাশি প্যাটেল এগিয়ে আসে—গুড আফটারনুন, মিস্টার বোস। এদিকে কোনো কাজ?

—হ্যাঁ। একটা বিজনেস মিটিং-অ্যারেঞ্জে বুকিং করতে এসেছিলাম।

—আপনি খুব সিরিয়াসলি বিজনেসটা প্রমোট করেন দেখছি।

—এটা না চালালে, আমি আর স্টাফরা যে খেতে পাব না ম্যাডাম। তাই বাধ্য হয়ে চালাতে হয়।

—চলুন একটু কফি হোক।

—ইটস্ মাই প্লেজার।

কফি আর স্ন্যাকস্ নিয়ে সৌরক রাশির সঙ্গে কোম্পানির বিভিন্ন প্রজেক্ট ডিজাইনে মডেলিং ও সেলস্ প্রোমোর ব্যাপারে কথা বলে।

—প্লিজ ডু কাম টু মাই অফিস। ওয়ান মিনিট। টু ডে ইস ওয়েডনেসডে। ইউ মাস্ট কাম অন ফ্রাইডে, অ্যাট ইলেভেন এ. এম. সার্প।

—সৌরক, থ্যাঙ্কস্ ফর দ্য কফি।

বিল মিটিয়ে অফিসে আসে সৌরক। পরের দিন বিজনেস প্রোমোশনের জন্য অ্যাডের গুরুত্ব নিয়ে একটা মিটিং-এ বসে। সবাই বলে–খরচ কিন্তু বাড়বে। নতুন অর্ডার না এলে কিন্তু ঘরের টাকা যাবে। একটা রিস্ক নিতে সকলে রাজি হয়। ছোট করেই হোক প্রিন্ট আর ভিডিও দুটো অ্যাডই যাবে। কী রেসপন্স হয়, সেটা দেখে, পরের কনট্রাক্ট হবে।

শুক্রবার ঠিক এগারোটায় রাশি আসে। মুখে ওড়না ঘেরা। চোখে বড় গগল্স। জিনস আর পাঞ্জাবি। সৌরকের প্রোডাকসান ইউনিটের সবাইয়ের সঙ্গে মিটিং শুরু হয়। রেট, অ্যাডভান্স নিয়ে আগেই কথা হয়।

সৌরক বলে—রেট নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। প্রোমো ডিজাইনিং নিয়ে বলুন।

রাশি বলে—সাবজেক্ট অনুযায়ী প্রোমো ডিজাইনিং হবে। মডেল কেবল সাপোর্ট করবে।

অতনু জিজ্ঞাসা করে—আমাদের তো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ। ফোকাসিং কীভাবে হবে?

—প্রোজেক্ট পাবে সেভেন্টি পারসেন্ট ফোকাস, রেস্ট থার্টি মডেল আর কনটাক্ট ডিটেলস্।

হিমাংশু বলে—স্টিল আর ভিডিও শ্যুট আউট হলো। দুটো ফরম্যাটের প্রোমো সেলিং-এর কী হবে?

—ইউ শুড নট ওরিড অ্যাবাউট দিস। আই হ্যাভ মাই পারসোন্যাল অ্যাড কনট্যাক্ট বোথ প্রিন্ট মিডিয়া অ্যান্ড অলসো ভিডিও।

সৌরক জিজ্ঞাসা করে—হাউ ইউ চার্জ ফর ইট?

—টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য পেমেন্ট।

—এটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।

—দেখুন আমাকেও বিজনেসটা চালাতে হবে। সব স্টাফেদের পেমেন্ট আছে।

—বুঝলাম। আচ্ছা, দেখি একটা ভেঞ্চার করে।

কয়েকদিন বাঁকুড়ার নতুন প্রজেক্টটা নিয়ে, রাশির সব স্মার্ট মেয়েদের নিয়ে শ্যুটিং চলে। এডিটিং শেষ হয়। স্টিল শটস্ আর ভিডিও ফাইল-এর সেলস্ প্রোমো দেখার জন্য সৌরক, রাশি আর কোম্পানির সবাই জড়ো হয়। স্টিলগুলো আস্তে আস্তে খুঁটিয়ে দেখা হয়। কখন যেন রাশির হাত সৌরকের হাতে এসে যায়। হাতে হাতে স্পর্শের খেলা।

পরের কয়েকদিন অ্যাড প্লেসমেন্টের জন্য রাশি আর তার টিম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাবলিক রিলেসান্স-এর দায়িত্বে অতনু সব অ্যাড পোস্ট-এর ডিটেলস্ নোট রাখে। সৌরকের কনসার্ন মিডিয়ার প্রচারে বেশ জনপ্রিয় হয়। অনেক নতুন প্রজেক্টের অ্যাসাইনমেন্ট আসে। ব্যবসার বিস্তৃতি হয়। সৌরকের এজেন্সী রাশি প্যাটেলকে কাজে লাগিয়ে দৌড় শুরু করে।

সকালেই লিগ্যাল অ্যাডভাইসার চিত্তপ্রিয় মজুমদারের ফোন —সৌরক, পারলে একবার চেম্বারে এসো। খুব আর্জেন্ট।

সৌরক ব্রেকফাস্ট সেরে বাগানের গাছগুলোর একটু তদারকি করবে ভেবেছিল। হলো না। গাড়ি নিয়ে বেড়োয়।

—এসব কী শুরু করেছো? কোম্পানি কী লাটে তুলবে? তুমি নিজেকে কী মনে করছো, বিশাল বিজনেস ম্যাগনেট হবে। সাতটা লিডিং বাঙলা কাগজে তোমার বিজ্ঞাপন। শুনেছি নিউজ চ্যানেলগুলোতেও তোমার অ্যাড এক মাস চলবে। মান তুমি জাল ফেলে পুঁটি, মৌরলা থেকে রুই, কাতলা সবই তুলবে। কী হবে, ভেবে দেখেছো? আমাদের অ্যানুয়াল রিপোর্ট, অডিট রিপোর্ট, ট্যাক্স পেমেন্ট, অ্যাসেসমেন্ট সব কীভাবে হয় দেখেছো তো? বাঘ যখন বাচ্চা থাকে, তখন সবাই বাঘছানা বলে, আদরও করে, আর সে যখন বিশাল হয়, তখন সকলের মামা হয়ে যায়। বনের রাজা। তুমি মামা হতে চাও? মামাবাড়ি দেখেছো। আর রাজা হয়ে কাজ নেই। বন্ধ করো এসব। সকলের চোখে পড়লে—দুটো খাতা সাদা আর কালো, রাখতে পারবে তো?

সৌরকের গুলি লাগা কাঁধটা ব্যথা করে ওঠে। চিত্তকাকু জানে না কালোর কী মোহ। অতগুলো ঝি, চাকর, দরোয়ান, স্টাফ পোষা, খরচের বহর কী করে সামলাতে হয়,—তা তো জানো না। এর থেকে বাঘ পোষা সস্তার। লোকে সম্মান করবে,

যদি বন দফতরের রেহাই মেলে।

—ঠিক আছে, কাকু তুমি যখন বলছো। আমি স্প্যানটা কমিয়ে দেবো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছোট থাকা ভাল। বেশি বড় হয়ে আকাশ ছুঁয়ে দেখার সাধ না করাই ভাল। তখন সকলের চোখ আকাশের দিকে না হয়ে, কেবল তোমাকে দেখবে।

—উঠছি তাহলে, আজ।

—দাঁড়াও, গরমাগরম লুচি হচ্ছে, আলুর দম আর রসোগোল্লা। বাধ্য ছেলের মত খাবে। তারপর যাবে।

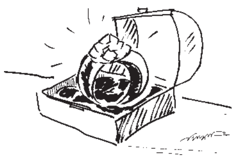

পামেলা অ্যাটাচি নিয়ে যেতে পারলো কই? অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর টাইমের আগে এসে গেছে। সৌরক অভ্রকে ডেকে জেনে নেয় যে, অফিসে পামেলা এসেছে।

—মে আই কাম ইন সৌরক।

—ওঃ! সিওর, সিওর। ইটস্ মাই প্লেজার।

পামেলা সৌরকের চেম্বারে বসতে বসতে অ্যাটাচি থেকে কাগজপত্র বের করে।

—আমি সব গুছিয়ে, রেডি করে এনেছি। আমার ল-ইয়ার মিস্টার কুলকার্নি সব ড্রাফট্ চেক করেছেন। এখন খালি তোমার সিগনেচারগুলো লাগবে।

—ওকে, ওকে। আমি একটু দেখে নিই।

সৌরক চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারে কোথাও ওর কনসার্ন সরাসরি ব্যবসা পরিচালনায় আসছে সেই পয়েন্টটা ক্লিয়ার নেই। পার্টনারশিপ ডিডও অসম্পূর্ণ। টাকা লেনদেন প্রসঙ্গে পামেলার কনসার্ন মূখ্য নিয়ন্ত্রক থাকবে।

—কী এ্যাতো দেখার আছে। একবার শুরু করো, আমার প্ল্যান মাফিক দেখবে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছবে।

সৌরক অ্যাটেনডেন্ট বেলটা পুশ করে। 'স্যার আসছি' বলে রজত ঘরে ঢোকে।

—হ্যাঁ, এই ফাইলগুলো নিয়ে একবার অ্যাকাউন্টস্-এর সত্যদার কাছে যাও। পেমেন্ট দিতে কতদিন লাগবে জানাতে বলো।

পামেলা খুশিতে ঝক্ ঝক্ করে। তাহলে সৌরককে থুড়ি সৌরকের টাকা দিয়ে আবার ব্যবসাটা বাড়ানো যাবে।

—তুমি এখন এসো। সন্ধেয় আমাকে একটা ফোন করো। সেদিনের ডিনারটা বাকি আছে।

—ওঃ! তুমি না! কী খাবে বলো? আমি রেডি।

—লেটস্ হোপ ফর দ্য গুড, বাই।

পামেলা বেরিয়ে যায়। রাশি প্যাটেল অফিসে ঢোকে। দূর থেকে পামেলাকে দেখে একটু আড়ালে সরে যায়। অফিসেই অতনুকে দেখতে পায়।

—আরে! অতনু, কেমন আছো? স্যার আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ম্যাডাম, চেম্বারেই পাবেন। এই অ্যাতক্ষণ তো পামেলা ম্যাডাম-এর সঙ্গে মিটিং চলছিল।

—পামেলা, এখানে?

—হাঁ, স্যার মনে হয় ফ্যাসন ডিজাইন-এ ব্যবসা এক্সপান্ড করবেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আজই অফিসে কনট্রাক্ট, ডিড, লিগাল নোটিশ সব ফাইলে জমা পড়েছে।

—ওঃ! তাই না কী?

—হ্যাঁ, মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসার পেমেন্ট অর্ডার বেরোবে।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি আসছি।

—স্যার-এর সঙ্গে দেখা করবেন না। উত্তর না দিয়েই রাশি অফিস থেকে চলে যায়। ব্যাগ থেকে সিম-এর প্যাকেট বার করে। মোবাইলে সিম চেঞ্জ করেই পামেলাকে ফোন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে বলে—আমি লুধিয়ানা থেকে এখানে এসেছি। হোলসেল-এ ব্যবসা করি। ভাল কিছু সারপ্লাস ফাব্রিকস্ আছে। একটু আপনার সঙ্গে কনটাক্ট করতে চাই। আপনার তো ফ্যাসন ডিজাইন-এর ব্যবসা, যদি লাগিয়ে দেন খুব কমে ছেড়ে দেব।

পামেলা খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে—সে তো খুব ভাল কথা। আপনি এখনই চলে আসুন। গড়গড় করে ঠিকানা বলে দেয়। রাশি ফোনটা ডিসকানেক্ট করে। পামেলা ফ্ল্যাটে আনন্দে বিছানায় গড়াগড়ি খায়। সৌরকের টাকা, লুধিয়ানার কাপড় তাও ডিসকাউন্টে। ওফ! যা হবে না। নাঃ, ব্যবসাটা এবার জমিয়ে করতে হবে। একটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স চাই। এই কেলো-ঝুলো ঝুপড়ি ফ্ল্যাটটা ছাড়তে হবে।

—দরজায় বেল বেজে ওঠে। আনন্দে দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে পামেলা। দরজার ওপাশে ওড়নায় মাথা ঢেকে দাঁড়িয়ে, রাশি প্যাটেল। পামেলা চমকায়।

—কী হলো? ভেতরে আসতে বলবে না?

---হ্যাঁ, হ্যাঁ। এসো, এসো। আসলে আমি একটু বেরোবো। তুমি যদি পরে আসতে....

—আসলে, আই অ্যাম অলসো ইন এ হারী। লাস্ট সিক্স

With best compliments -

A
well
wisher

মানথস্-এর হিসাব আর পেমেন্ট পাচ্ছি না। তাই এলাম।

—সব হবে। সব মিটিয়ে দেবো।

—একথা আমি ছয় মাস ধরে শুনছি। আমি কাজ করেছি। পয়সা বাকি আছে তুমি পেমেন্ট করবে। তোমার, কী প্রবলেম? দ্যাটস্ নান্ অফ মাই বিজনেস। আই অ্যাম নট অ্যাট অল ইনটারেস্টেড অ্যাবাউট ইওর প্রবলেম।

—বাঃ! বাঃ! একসঙ্গে কাজ করলাম। পেমেন্ট বাকি পড়ে আছে। আমিই মার্কেট থেকে টাকা তুলতে পারিনি। তাই দেরি হচ্ছে।

—এই দেরি, দেরি করে অনেকদিন হয়েছে। তাহলে আমাকে কোন একটা ডিশিসন নিতে হবে।

—আমি আর পার্টনারশিপে থাকছি না। তোমার সেলস্ প্রোমো ব্যবস্থা করে নেবে।

—নাঃ, প্লীজ। একটু বোঝার চেষ্টা করো। পামেলা একটু ভেবে নেয়,– আজ রাতের পর, আমি সব পেমেন্ট ক্লিয়ার করে দেবো।

—এ্যাঁঃ? আজ রাতে? রাত্রিতে কী এমন ম্যাজিক হবে, যে টাকা ঝরে ঝরে পড়বে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ম্যাজিক আছে। জানবে পরে।

—নতুন বিজনেস প্ল্যান বুঝি! নতুন অর্ডার পেয়েছো? কত টাকার?

—সব জানবে। অ্যাত আগ্রহ ভাল নয়। এবার এসো।

—কী আসবো? ওসব বুলিতে কিছু হবে না। টাকা চাই। আমি জানি না ভেবেছো, সৌরক বোসের কনসার্ন-এ তুমি ঢুকছো। ভেবেছো সৌরক অত বোকা। সেও বিজনেসম্যান। ভালোই বোঝে ব্যবসা। তোমার কী আছে? ঐতো একটা ভাঙ্গাচোরা শোরুম আর গুটি কয়েক বাতিল জামাকাপড়। কী দেখে সৌরক আসবে?

—আসবে, আসবে। আমাকে দেখে আসবে। আমার প্ল্যানের জন্য আসবে।

—ছাড়ো। তুমি আর কী দেখাবে। কতজনকে তো দেখালে। আমার পয়সা কী করে আদায় করতে হয় জানি। এখন রেস্ট নাও।

রাশির কথায় পামেলা রেগে আগুন হয়ে যায়। কোন কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না। মাথাটা ঠান্ডা রেখে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে,—কখন আসবে লুধিয়ানার কাপড় নিয়ে মিসেস ভাটিয়া।

সৌরক আজ সন্ধে অবধি অফিসে। অ্যাকাউন্টেন্ট আর দুজন স্টাফের সঙ্গে পামেলার ফাইলটা নিয়ে আলোচনা হয়।

—স্যার, একেবারে ফাঁকিবাজি। এমন আইন বাঁচিয়ে ড্রাফট করা যে টাকা যোগানোর দায়িত্ব আমাদের....

—আর স্যার, বিজনেস কনট্রোল কিন্তু ওদের থাকবে।

—আর একটা জায়গা নোট করেছেন, বিজনেস রিটার্ন কীভাবে পাওয়া যাবে বা পেমেন্ট কীভাবে হবে, তার কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। লস হলে ইনভেস্টর ডুববে। কিন্তু প্রফিটে কার দিকে টাকাটা যাবে?

—ঠিক আছে। আপনারা আসুন। ফাইলটা কপি করে চেপে যান।

—সে আর বলতে স্যার, আমরা অলরেডি কপি করেছি প্লাস স্ক্যান করে আমাদের ডেটা স্টোর-এ রেখেছি।

মোবাইলটা বেজে ওঠে।—গুড ইভনিং। সিওর, সিওর। ইটস্ মাই প্লেজার। আই উইল সিওরলি রিচ এ্যাট এইট সার্প। ওকে, বাই। সৌরক হেসে ওঠে। পামেলাকে আস্তে আস্তে বন্ধুত্বের স্বাদ পাইয়ে দিতে হবে। তারপর ওর ঐ ফ্যাশান বিজনেসের এ-টু-জেড জেনে ঋতিকাকে একটা পাকাপাকি ইউনিট করে দিলেই হবে। সত্যি, মেয়েটা অনেক করেছে। সার্কাস ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল বলেই হয়তো অ্যাত স্মার্ট আর ফিট। পামেলা তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে। বাজনা দেখনি তো, যখন বাজবে.....

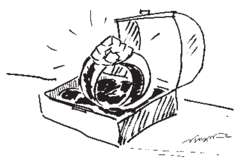

সব লক করে, এ.সি. অফ করে। গার্ড এসে সব বন্ধ করে। গুড নাইট বলে সৌরক বেরিয়ে যায়। পথে একটা বিয়েবাড়ির আলোর রোশনাই, মিউজিক মনটাকে কেমন যেন উদাস করে দেয়। গাড়িটা স্লো করে। সাইড ইনডিকেটার জ্বেলে একটু দাঁড়ায়। এরকম উৎসব ওর জীবনে আসেনি। মিতাশার কথা মনে পড়ে যায়। কিসব কালারফুল ড্রেস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট-এর মেয়েরা তদারকি করছে। রঙিন আলোর ফোয়ারার পাশে হাসির হুল্লোড়ে সৌরকের চোখে জল এসে যায়। ঐ বাস্টার্ড নিমাই বাগচিকে যদি পেতাম, তাহলে শালা ড্রাইভারের ড্যামিতে খরচটা বেঁচে যেত। রাগে গরম হয়ে যায় মাথাটা। চট্ করে গাড়ি স্টার্ট করে।

—আরে দেরি করলে....

—সরি, সরি। কিছু কাজ এসে গেল।

—কাজ, কাজ আর কাজ। কখনও তো রিলাক্স করো। আরও কত কী বলছিল পামেলা। কিছুই মাথায় ঢুকলো না।

হ্যাঁ, হুঁ, —হেসে ম্যানেজ করে ডিনারটা শেষ করে। পামেলা আজ লো-ওয়েস্ট শাড়ি পড়েছে। লেহাঙ্গা ব্লাউজ। চুলটা বেশ টেনে, কায়দা করে পাশে বেঁধেছে। সৌরক কেবলই পামেলার মুখটা দেখে। মেকাপের আড়ালে শুকনো। বয়সে যেন রুক্ষ। বিয়েবাড়ির সেই সানাই, কানের মধ্যে ঘুরপাক খায়। ফুলশয্যার খাটটা যেন হারিয়ে গেছে।

—আরে, আরে। কিছু তো বলো?

—দারুণ খাবার। ভেরি টেস্টি, ওঃ! পেট ভরে গেছে।

—এতেই পেট ভরে গেল। ইয়ং বয়েস। টেস্ট পেলে কোথায়? খাবারের.... হিঃ হিঃ হিঃ

—ওকে, ওকে। চলো ওঠা যাক। বিল মিটিয়ে পামেলাকে নিয়ে সোজা সৌরক বাড়ি চলে আসে। অনন্ত দরজা খোলে। —আমি খেয়ে এসেছি। তোমরা খাওয়া দাওয়া করে নাও। আমি একটু ম্যাডামকে নিয়ে মিটিং-এ বসবো।

—ঠিক আছে দাদা। সব বন্ধ করে দিচ্ছি।

সৌরক পামেলাকে নিয়ে ওপরে আসে। সামনে কেবলই মিতাশার চন্দন পরা মুখটা যেন দেখতে পায়। ঘরে ঢোকে। মনে হয় খাটটা যেন কেউ ফুল দিয়ে সাজিয়েছে। —এসব কী হচ্ছে? তাড়াতাড়ি ও বাথরুমে যায়। মুখে-চোখে জল দেয়। ফিরে এসে দ্যাখে পামেলা খাটে বসে। এ.সি.-টা চালায়। একটা সফ্‌ট মিউজিক অন্ করে। পামেলার পাশে বসে। পামেলা ওর মাথার চুলে হাত বোলায়।

—আমার বিজনেস প্ল্যানটা ঠিক আছে তো? আচ্ছা পেমেন্ট কবে পাচ্ছি? মালপত্র কিনতে হবে। লেবার কনট্র্যাক্ট হবে?

—হবে, হবে। সব হবে। ফ্যাসন ডিজাইন হবে। পামেলার চোখে পড়ে কর্নার টেবিলে একটা মেয়ের কয়েকটা ছবি। টুক করে তুলে নেয়। রাশি প্যাটেল ও তার মেয়েদের সৌরকের প্রজেক্ট প্রোমোর ছবিগুলো যেন পামেলার দিকে অবজ্ঞায় খ্যাক খ্যাক করে হেসে ওঠে।

দুপুরে অফিসে পামেলাকে আলাপ করিয়ে দেয় ঋতিকার সঙ্গে।

—ইনি ঋতিকা দাশগুপ্ত, এখন থেকে ফ্যাসন ইউনিটটা ইনিই দেখাশোনা করবেন।

—ইফ ইউ সো কাইন্ড এনাফ টু ডিসকাস দ্য হোল ম্যাটার উইথ হার।

—ওঃ! সিওর, সিওর।

—তাহলে, ঋতিকা তুমি বুঝে নাও। ম্যাডামের সঙ্গে তোমার কেবিনে আলোচনা করো।

ঋতিকা কথা বলতে বলতে, আড্ডার মাঝে সব ফোন নম্বর, ঠিকানা, মেটিরিয়ালস্, মেশিন, ওয়ার্কার সব খবরাখবর নিয়ে নেয়। ঋতিকা কায়দা করে জানায়,

—এখন তো ধরুন আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা যাবে। শুরু করতে হবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু এখন ট্রান্সফার না করাই ভাল। আসলে ওটা আমার আর রাশির জয়েন্ট নামে ছিল। আমি কদিন ওটাকে বন্ধ রেখেছিলাম, কোম্পানির একটা চিঠি ধরিয়ে....

—ওটা তো চালু করতে হবে। না হলে, অ্যাতগুলো টাকা....

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি আজই মিঃ কুলকার্ণির কাছে যাচ্ছি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আশা করছি, অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। আমি ফোন করছি, তোমায়—বলেই বেরিয়ে যায়।

ঋতিকা হাসতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফোন আসে। ঋতিকা আবার একটা ফোন করে।

মর্টন স্ট্রীটে পামেলার ফ্ল্যাটে তুমুল ঝামেলা। ওয়ার্কাররা সব বাকি টাকার জন্য ভিড় করে। পামেলা বুঝিয়ে সকলকে ফেরত পাঠায়। ঋতিকা, সৌরক কাউকে মোবাইলে পায় না। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে ওঠে। ব্যাঙ্ক থেকে জানায় পার্টনার রাশি প্যাটেল অ্যাকাউন্ট থেকে.... সবটা পামেলার আর শোনা হয় না। মাথাটা ঘুরে যায়। রাতে মর্টন লেনে পুলিশের আনাগোনা। অ্যাম্বুলেন্স। দরজা ভাঙ্গা হয়। খাটের উপর ওষুধের খালি ফাইল, মদের বোতল, প্লেটে কিছু চিপস্। ভাঙ্গা গ্লাসের টুকরো আর উপুড় হয়ে পড়ে আছে পামেলার লাশ। ঘরের জানলাটা আশ্চর্যভাবে খোলা। ছিটকিনি ভাঙা। পাশেই দেওয়ালে রেন ওয়াটার পাইপের সারি। নিচে কার্নিশ। কোন অত্যাচার বা ধর্ষণের চিহ্ন নেই। কিছু চুরি হয়নি। শুধু দেওয়ালে, একটা দু হাতের ফাঁকে সূর্যোদয় ধরার সিনারি ঘড়ি ছিল। দু হাতের ফাঁকে ঘড়িটা ভাঙ্গা অবস্থায়।

অমৃতা ফোনে সৌরককে পামেলার মৃত্যুসংবাদ জানায়। সুইসাইড কথাটার উপর জোর দেয়। সৌরক দুঃখ প্রকাশ করে। অমৃতা সৌরককে বাড়িতে ডাকে। সৌরক কথা প্রসঙ্গে এড়িয়ে যায়।

সৌরক পুলিশী তথ্য জেনে নেয়। মর্টন স্ট্রীট কোন থানার আন্ডারে, কে কেসটা দেখছেন,—সব ডাটা এলাকার নেতা মণিকান্তকে জানায়।

—আরে সৌরক, কিছু চিন্তা নেই। এটা আত্মহত্যা। তোমার পার্সোনাল বা সেন্টারের কোন কিছু নেগেটিভ হবে না। ফান্ডে কিছু পাঠিও। আর থানায় কিছু দিও। ব্যস ব্যস। ওকে;—বাই।

সপ্তাহ খানেক পরে সৌরক অমৃতার বাড়িতে যায়।

হ্যান্ডিক্রাফট্স-এর অর্ডার এসেছে। কিছু প্রোডাক্ট-এর ছবি তুলে একটা ব্রোশিওর বানাতে হবে। তারই প্ল্যানিং, খরচ, একটা পার্মানেন্ট সেলিং ইউনিট—এসব ব্যাপারে আলোচনা চলে। হঠাৎই অরিত্র এসে ঢোকে ড্রয়িংরুমে। মদে চুর। ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না।—মা, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে—,

সৌরক সঙ্গে সঙ্গেই বেড়িয়ে যায়।

—মা, এই সৌরক বোসের কোম্পানি নিয়ে অ্যাত মাতামাতি কেন? শুনছি, আমাদের কোম্পানি টপকে, ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছ। কমিশন খাচ্ছে, শালা ওদের লোক।

—ও তুই বুঝবি না। তোর বাবাও চিরকাল সরকারের গোলাম রয়ে গেল। আর তুই হয়েছিস—থাক্ আর মাতলামি করিস না।

—কী আমি মাতাল? আর তুমি ধোয়া তুলসী? ফোনে খালি গুজুর, গুজুর।

—শোন্, গুজুর, গুজুর নয়। নিজে করতে গেলে প্রচুর পেপারস্ লাগে। ট্যাক্স পেমেন্ট থাকে। লেবার প্রবলেম তো আছেই। আমি দিই না একটু কমিশন। আমার ব্যবসা তো বেশ চলে যাচ্ছে। চিৎকার, চেঁচামেচিতে, সিঁড়িতে মিতাশা দাঁড়িয়ে সব শুনলো। অরিত্র মাকে জড়িয়ে ধরতে যায়। টাল সামলাতে না পেরে ধপ্ করে সোফায় বসে। অরিত্রর মাথাটা ঝিম ঝিম করে। হঠাৎ দেখে মিতাশা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তাহলে সৌরক যখন আসে, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, যদি মা না থাকে... চিন্তার জালটা ছিঁড়ে যায়। সৌরক যদি মিতাশার কাছে যায়, চোখ দুটো বুজে ফেলে। হাত দিয়ে মাথার চুলটা চেপে ধরে।

পরের দিন দুপুরে ইলেকট্রিকের লোক আসে, সব ঘরের লাইন চেক করে। অরিত্র নিচে বসে থাকে। —সব চেক করেছো। কোনো ফল্ট ছিল?

—হ্যাঁ, দু এক জায়গায় যা ছিল রিপেয়ার করে দিয়েছি। পাঁচটা সুইচ চেঞ্জ করেছি। দুটো প্লাগ গোলমাল ছিল। সব হয়ে গেছে। মেন ইউনিটে একটা এম. সি. ভি. বসিয়ে দিচ্ছি। অটো কাট থাকবে।

অরিত্র অফিসে ফিরে আসে। বাড়ির সব ঘরের খুঁটিনাটি শব্দের রেকর্ডিং ভালোই বুঝতে পারে। বিষ্ণুকে ধন্যবাদ দিয়ে পয়সা মিটিয়ে দেয়; —যা করে দিয়েছি না, অরিত্রদা; সব রেকর্ডিং পাবে।

সৌরক গাড়ি নিয়ে আসছিল, মিতাশার বাড়িতে। হঠাৎ দেখে সালামও ঐ একই দিকে এগোচ্ছে। সৌরকের গাড়ি দেখে আড়ালে সরে যায়। সৌরক চম্‌কে ওঠে—সালাম, এখানে কী করছে? এ রাস্তায় কেন? এই দুপুরবেলা? —যাহোক ভেবে লাভ নেই।

মিতাশা একাই ছিল। সরবত দেয় সৌরককে। বেডরুমে নিয়ে যায়।

—জানো, আমাদের আর বাচ্চা হবে না। একটা বাচ্চা না হলে মানায়, বলো।

—আমাদের মানে ঠিক বুঝলাম না।

—আমাকে যতই অলক্ষ্মুণে, বাঁজা বলুক। আমি সব টেস্ট করিয়েছি। নর্মাল রিপোর্ট। অরিত্র তো কোনো টেস্ট করায় নি। কিন্তু ডাক্তার ইঙ্গিত করেছিল, অতিরিক্ত মদ খাওয়া আর ছোট বয়স থেকে নেশার জন্য.... কথা শেষ করে না মিতাশা। সৌরকের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে, তুমি আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি মা হতে চাই। একদিন বাবা তোমায় হীরের আংটির জন্য অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আর জানো সেই বাবা দাম্ভিক; সামান্য দশ হাজার দিতে দেরি করেছিল বলে সবার সামনে কী অপমানটাই হজম করেছিল। ঠিক হয়েছে। জামাই দেখানো। মিতাশা কেঁদে ফেলে, আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। আমি তোমার হাতে পরিয়ে দেবো হীরের আংটি যেমন তোমার পছন্দ। আমাকে মা হওয়ার সম্মানটুকু দাও।

সৌরক চুপ করে চেয়ে থাকে। নিশ্চল। চোখ থেকে জল পড়ে মিতাশার হাতে।

উঠে পড়ে। কোন উত্তর না দিয়ে বেড়িয়ে যায়। মিতাশা পথ আটকায়।

—দ্যাখো। এটা হয় না। তুমি এখন পরস্ত্রী। তোমার একটা সম্মান আছে। এবাড়ির একটা মর্যাদা আছে।

—সম্মান? মর্যাদা? টান মেরে বুকের কাপড় সরিয়ে দেয়।

—এর ভেতরটায় কখনও খবর নিয়ে দেখেছো, মেয়ে-স্ত্রী হিসাবে আলাদা পরিচিতি হয়।

রাস্তায় হঠাৎ একদিন সৌরককে দেখে মিতাশা প্রায় জোর করে গাড়িতে ওঠে। মিতাশার বাড়ি যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে সৌরক 'হিডেন হিট' ক্লাবে যায়। পুলের ধারে বাউন্সারদের সঙ্গে সালাম কথা বলছে। সৌরক দেখে চমকে ওঠে। মিতাশা বলে—ঐ দ্যাখো সালাম এসেছে। নিশ্চয় এখানে অরিত্র আছে।

—তুমি সালামকে চিনলে কীভাবে? ও তো আন্ডার ওয়ার্ল্ড ডন যোহান-এর ডান হাত। সুপারি কিলার।

—আমি দেখেছি প্রায় আমাদের বাড়িতে নজর রাখে। তুমি বসো, আমি একটু আসছি।

মিতাশা বেয়ারার সঙ্গে কথা বলে। বেয়ারা ইশারায় কিছু দেখায়। সানগ্লাসে চোখ ঢেকে একটা কোকের বোতল নিয়ে চেয়ারে বসে দূরে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসে। —সৌরক এখান থেকে চলো। খুব বিপদ। বিল দিয়ে সৌরক জিজ্ঞাসা

LASER CABLES PRIVATE LIMITED
LUMINO INDUSTRIES LTD.

PRODUCTS : LT PVC/XLPE POWER & CONTROL CABLES, LT/HT AERIAL BUNCHED CABLES, AAC, ACSR & AAAC CONDUCTORS

EPC DIVISION : RE PROJECTS, APDRP PROJECTS, R-APDRP, SUB-SATION ETC.

USHA KIRAN, 12A, CAMAC STREET, ROOM NO. 5A, 5TH FLOOR, KOLKATA-700 017

Phone : +91 33 2282-9201 (5 lines), Fax : +91 33 2282 9206

E-MAIL : laser@lasercables.com, Website : www.lasercables.com

Toni Sales Corporation

5140/24, Rui Mandi, Sadar Bazar, Delhi - 110 006

করে—কী হয়েছে? বলো।

—এখন কিছু বলা যাবে না। আমি বুথ থেকে তোমায় ফোন করবো। আমার বাড়িতে তুমি এখন আসবে না। তোমার অফিসে যাও।

বাড়ি ফিরেই মেন সুইচের কাছে একটা কালো রঙের বাক্স দেখতে পায়। বাক্সটা খুলতেই চারটে মাইক্রো রেকর্ডার চোখে পড়ে। তন্ন তন্ন করে খোঁজে। হাঁপিয়ে যায় মিতাশা। হঠাৎই মনে পড়ে বিষ্ণুর কথা। যে যে জায়গায় ও খুটখাট করেছিল, সেখান থেকে পায় নানা রকমের মাইক্রোফোন রিসিভার। শোবার ঘরে টেস্টার পড়ে যাবার অছিলায় বড় শো-পিসটা নাড়াচাড়া করেছিল। মিতাশা ভালো করে দেখে চোখটা চক্ চক্ করছে, দুটো মাইক্রোচিপ। মাথা চাপড়ায় মিতাশা। তার মানে সব কথা, অনুনয়, ঝগড়া এখন রেকর্ডিং হচ্ছে। ঢক্ ঢক্ করে জল খায়। ঘাড়, গলা, মুখের ঘাম মুছে, বেড়োয়। বুথ থেকে ঝড়ের বেগে সৌরককে সব জানিয়ে দেয়। সৌরক সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের নেটওয়ার্কে সব যোগাযোগ করে। প্রোটেকশানের ব্যাপারে কথা হয়। তাহিরকে দিয়ে অফিসের মেয়েদের জন্য বাউন্সার নিতে চায়। কিন্তু তাহির জানায় দুদিন সময় দিতে হবে। একটা বাঙলা ফিল্মের আউটডোরে অনেকে চলে গেছে। ফিরে এলেই পাঠাবে।

কুয়াশা ঘেরা সকালে, শরীর চর্চায় ব্যস্ত মানুষজনের মাঝে সৌরক ও জেনারেল ম্যানেজার নীলেন্দু সেন কসরত চালিয়ে যায়। ওয়ার্কআউট শেষ করে। সৌরক বলে—আজ রাশির পেমেন্টটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে।

—হ্যাঁ। উনি অনেক করেছেন। আমাদের এই পাবলিসিটি হাইকটা দরকার ছিল। আর কোন কিছু করা যায় কী না .... বলতে বলতে গাড়ির দরজা খোলে। স্টার্ট নেয় না। নীলেন্দু অনেক চেষ্টা করে। হঠাৎ দূর থেকে 'এক্সোটিকা ভিডিও'-এর মালিক সীলাস ডাকে – আরে, সৌরক না? কথা আছে বস্।

—দাঁড়া এক মিনিট। নীলেন্দু তুমি আমার গাড়িটা নিয়ে চলে যাও। ডোন্ট ওরি ফর ইওর কার। আই উইল ফিক্স ইট অ্যান্ড কল ইউ ব্যাক।

নীলেন্দু গাড়ি নিয়ে চলে যায়।

—তারপর সীলাস, কী খবর বল্?

—খবর সব তো তোমার। দ্যাখো অডিও-এর বাজার খুবই ডাউন। যা আছে টিম টিম করে এখনও ঐ ভিডিও। তোমার সেলস্ প্রোমো আমি দেখেছি। আমি ঐ টিমটাকে চাই।

---চাইলেই পাবে। একি হাতের মোয়া? কন্ট্রাক্ট-রেট-প্রজেক্ট-টাইম সিডিউল সব দেখতে হবে না।

—আমি কিছু বুঝি না। বলে দিলাম, ব্যস। কবে, ফোন করবো বল্?

—ঠিক আছে। আমাকে দুদিন বাদে কল্ কর্।

সৌরক পল্টুকে ডাকে। মাঠে অপেক্ষা করে। আধঘণ্টার মধ্যে একটা ছেলেকে নিয়ে পল্টু আসে। টুক-টাক-খুট-খাট করে সব খুলে ফেলে। আবার কী সব লাগায়। গাড়ি স্টার্ট হয়।

—দাদা, সার্ভিস করাতে বলো। নেহাত তুমি ছিলে, তাই করে দিলাম, যাক সকালবেলা বিশ্বকর্মার নামে কিছু দাও।

সৌরক তিনশো টাকা দেয়। —কিরে? হবে তো। খুশি।

—তুমি দিয়েছো, ব্যস। খেল খতম, পয়সা হজম।

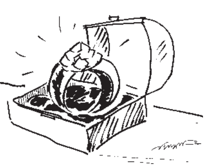

এফ. এম.-এ গান শুনতে শুনতে নীলেন্দু হালকা স্পীডে গাড়ি চালায়। পথে তখনও কুয়াশা। ভালো করে সব কিছু দেখা যায় না। ওর দুপাশে দুটি গাড়ি। সৌরকের স্মোক স্ক্রীন গ্লাস। নীলেন্দুর চোখে সানগ্লাস। কিছুতেই সাইড নিয়ে এগোনো যাচ্ছে না। একটু ফাঁকা হতেই জোরে ছোটায় গাড়ি। কিন্তু এগোতে পারে না। সামনে রড ভর্তি একটা বড় লরি। পেছনের ডালা খুলে, নিচের দিকে ঝুলছে। অনেক লোহার রড। একটা লাল রুমাল বাঁধা। নীলেন্দু খুব সাবধানে চালায়। ট্রাফিক হাল্কা হতেই সব গাড়ির স্পীড বাড়ে। বেশ জোরেই যাচ্ছিল নীলেন্দু। সাইড নিতে গিয়েও পারে না। হঠাৎই লরিটা আচমকা ব্রেক কষে। নীলেন্দু ধাক্কা মারে রডের লরিতে। উইন্ডশীল্ড ভেঙ্গে, নীলেন্দুর মাথা ফাটিয়ে, রড ঢুকে শেষ করে দেয়।

সৌরক খবরটা পায়। এটা কী ছক? তাকে মেরে ফেলার? ভাবতেই একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে ভাব পিঠের দিকে নেমে যায়। অফিসে খবর দিয়ে সকলকে সাবধান থাকতে বলে। অভ্রকে বলে—সেন্টার থেকে গাড়ি আনতে। মৃদুলকে সঙ্গে নিয়ে থানা-পুলিশ-মর্গ-নীলেন্দুর বাড়ি-সৎকার সব মিটতে মিটতে রাত সাড়ে বারোটা। একটু একা থাকার জন্য মোবাইলটা সুইচ অফ করে রেখেছিল। আবার সেন্টার থেকে অন্য গাড়ি আসে। গাড়িতেই মোবাইলটা বাজে,—হ্যাঁ বলছি।

—স্যার, আমি ঋতিকা বলছি। একটা খারাপ খবর আছে। আজই সন্ধ্যেবেলায় দুটো অপরিচিত ছেলে গলির মধ্যে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে রাশি প্যাটেলকে খুন করেছে।

—আচ্ছা আমি দেখছি।

মোবাইলটা হাত থেকে যেন পড়ে যায়। মাথাটা চট্ করে ঘুরে যায়। ভীষণ একা লাগে।

—ভাই, একটু দাঁড়াবে। অভ্র একটা ঠাণ্ডা মিনারেল ওয়াটার আনো না।

—হ্যাঁ, এক্ষুনি।

ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায়, তৃষ্ণা মিটিয়ে সৌরক একটু স্টেডি হয়। বাড়ি এসে যায়। সৌরক নেমে ঢুকে পড়ে। দরোয়ানকে সজাগ থাকতে বলে, ভেতরে যায়। অনন্ত দরজা খুলে দেয়। স্নান সেরে একটু হাল্কা খাবার খেয়ে নিজের ঘরে যায়। তখনও কর্ণার টেবিলে অনাদরে রাশির ছবিগুলো ছড়িয়ে আছে।

—আচ্ছা গুলি করলে কী খুব লাগে? ওঃ রাশির তাহলে কী কষ্ট হয়েছে। আমি তো কারুর ক্ষতি করিনি। ছোট কমপিউটার সেন্টার সামলে সেল্স-এর কাজে হাত পাকিয়ে এই কনসার্ন চালাচ্ছি। মিতাশার ফ্যামিলিকে অবহেলা করিনি। কাউকে অপমান করিনি। আমার সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের শেষ করে দিচ্ছে কে?—এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন সৌরক খাটে উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল থেকেই অমৃতার বাড়িতে তুমুল অশান্তি। অরিত্র চেঁচাচ্ছে।

—ওসব সমবেদনা জানানো চলবে না। কীসের কে সৌরক বোস? আমাদের কী দরকার?

—তুই বুঝছিস না, এটা ব্যবসায়িক ভদ্রতা। এটা করলে মান বাড়ে।

—মানের আমি ইয়ে মারি। ওসব হবে না।

মিতাশা মিনমিন করে বলে—মা তো, ঠিকই বলছে।

—একদম তুমি বকবে না। তোমার পিরিতির নাগর। ভাবছো কিছুই আমি জানি না। তখনই জানতাম ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।

—চেঁচাস না। ষাঁড়ের মত।

—শোনো সকলকে সাবধান করে দিচ্ছি। সৌরক বিষয়ে কেউ ইন্টারেস্ট নেবে না। আর তুমি বাড়ির বৌ। একদম বেরোবে না। ব্যবসায় নাক গলাবে না।

সৌরক তাহিরকে ডেকে নেয়। ট্যাক্সি পাল্টে, সাধারণ হোটেলে বসে। বাউন্সার ও একজন গোয়েন্দা—কুশল দত্ত। ঠিক করে ফেলে প্ল্যান। আবার একটা অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে। মিতাশা জানিয়ে দেয়, অরিত্র সৌরককে খতমের প্ল্যান সেট করেছে। বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়ির পার্সোনাল ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মি. কুশল দত্ত অ্যাকাউন্টেন্ট-এর থেকে গল্পের ছকে জেনে যায়, কোম্পানির ডেবিট, ক্রেডিট - ব্যালান্স শিট-এর সব কপি তিনি নিজের কাছে রাখতেন। কখনও বাড়িতেও কোম্পানির গোপন নথি নিয়ে যেতেন।

—খবরটা কুশলের কাছ থেকে পেয়ে সৌরক চমকে ওঠে। —ঐ জন্যই কী অত বেশিক্ষণ অফিসে থাকতেন?

সন্ধেয় থানা থেকে খবর আসে বাড়ি ফেরার পথে জনবহুল স্টেশনে সৌরকের অফিসের অ্যাকাউন্টেন্ট আক্রান্ত হয়েছেন। হাসপাতাল থেকে ফার্স্ট এড করা হয়েছে। তার বয়ান অনুসারে সালামের সাকরেদরা কাজটা করেছে। কিন্তু সালাম আন্ডারগ্রাউন্ডে। কোনো ট্রেস নেই।

পরের দিন অফিসে শান্তিবাবু কেবলই পামেলা আর রাশির প্রোজেক্ট ফাইল খোঁজেন। কিন্তু সৌরক সব দরকারী কাগজপত্র, ফাইল, হার্ডডিস্ক আগেই সরিয়ে দিয়েছে।

কুশলের নজরদারিতে শান্তিবাবু কেঁদে ফেলেন—ঐ ফাইলদুটো দিলে আমি অনেকগুলো টাকা পাব।

—আর, অ্যাত দিনের সার্ভিসের এই রিটার্ন, কাকে দেবেন?

—আমি চিনি না। ভয় দেখিয়েছে, ফ্যামিলির ক্ষতি করবে।

—কুশলের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েই, প্রোটেকশানের জন্য ওকে ঋতিকার এলাকা কভার করতে বলে।

সন্ধ্যেবেলায় আবার খবর আসে বাসে উঠতে গিয়ে শান্তিবাবু মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। এখন হাসপাতালে ভর্তি। অজ্ঞান।

সৌরক মোবাইলের সিমটা পাল্টায়। দুটো মিস্ড কল দেয়। কল ব্যাক আসে। তাহিরকে কনসার্ন কভার করতে বলে। সব প্রজেক্ট টেম্পোরারিলি বন্ধ। সমস্ত ব্যাঙ্কিং অপারেশান নেটওয়ার্কে চলে। সৌরকের নিজেকে ভীষণ একা লাগে। —মিতাশা কী এখন সেফ? মিতাশা যদি ডিভোর্স ফাইল করে। ওতো সহজেই লিগাল সেপারেশান পেয়ে যাবে। ওটা বাড়ি—সংসার? মদ-ঝগড়া-সন্দেহ-অবহেলা-অপমান-এর মাঝে ওখানে মিতাশা কী করে আছে? মিতাশাকে কী অরিত্র মারধোর করে? নানান ভাবনায় মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে।

মদের গ্লাস হাতে নিয়ে অরিত্র চুপ করে বসে। একা একা নানান কথার ভিড়ে প্ল্যানটা ছকে নেয়। মা বাবা কেউ বিশ্বাস করলো না। আমিও ব্যবসা করতে পারি। আমাকে টেক্কা দিয়ে সৌরক বোস শালা। খুব বেঁচে গেছে। সালামকে বলি—উল্টোপাল্টা রিক্রুট করিস না। খালি কম রোকড়ায় ডিল কমপ্লিট করবে। মা কত টাকা সৌরককে পাইয়ে দিল। বাবাকে বললাম আমাদের কোম্পানিতে একটু টেন্ডার ধরিয়ে দিতে, —কিছু না। সব হিসাব মিলিয়ে মিলিয়ে নেবো। বউটাও শালা, —সৌরকের সঙ্গে আশনাই! কিন্তু সালামটা এখনও এলো না

কেন? সব ঠিক ফিট করেছে তো?

সন্ধ্যে হয়ে এলো। নতুন শাড়ি পরে অমৃতা চয়নকে নিয়ে বেরোয়। ফিডার রোডটা রাতে বেশ ফাঁকাই থাকে। অমৃতা ড্রাইভারের কাছে নতুন গাড়ি চালানো শিখেছে। ফিডার রোডের কাছেই গ্যারেজে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে ড্রাইভার কাশীনাথ। বয়স্ক মানুষ। একটু মদ আর মাংসে দুর্বলতা আছে। অমৃতা হাতে দুশো টাকা গুঁজে দেয়। তারপর গাড়িতে উঠে বেশ স্পীডেই বেরিয়ে যায়। শহর ছাড়িয়ে গাছপালায় ঘেরা মফঃস্বলের মাঝে অমৃতা মজা করে চালায়। চয়ন আড়ষ্ট হয়ে বলে, —একটু আস্তে চলো প্লীজ।

—তোমার বয়স হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। কেমন যেন বুড়িয়ে গেছ।

—আরে, গাড়িটা আস্তে করো না। এতে বুড়ো হওয়ার কী আছে?

—'এই পথ যদি না শেষ হয়'—গান ধরে, অমৃতা স্টীয়ারিং ছেড়ে দেয়।

—কী করছো কী? অ্যাক্সিডেন্ট হবে যে?—অমৃতা ব্রেকে চাপ দিয়ে দেখে কাজ করছে না। ভয়ে গীয়ার পাল্টাতে গিয়ে গিয়ার চেঞ্জ হয় না। অ্যাকসিলেটারে চাপ কমাবো না বাড়াবো—এই ভাবতে গিয়ে উল্টোদিকে আসা লরিকে পাশ কাটাতে গিয়ে, সজোরে ধাক্কা। চাপ চাপ রক্ত, ধোঁয়া, দুটো নিস্তেজ লাশ পড়ে থাকে রাতের গহীনে, কোন এক অচীনপুরে। পরদিন সকালে থানা, পুলিশ-মর্গ-জেরা-সৎকারে মিত্র বাড়িতে ব্যস্ততা। লোকজন আসা যাওয়া, পরামর্শ—এরই মাঝে পুলিশ এসে জানিয়ে দেয় প্রাথমিক তদন্তে গাড়ি ব্রেক ফেল করেই দুর্ঘটনা। রাতে খবর আসে কাশীনাথ ও গাড়ির যে মেকানিক কাজ করেছিল গ্যারেজে মদ-মাংসে খাওয়া-দাওয়া স্ফুর্তির সময় ইলেকট্রিক তারে জড়িয়ে হাই ভোল্টেজে মারা যায়। জানা যায়নি কার নির্দেশে রাতেও গ্যারেজ খোলা ছিল। গ্যারেজের মালিক এখানে নেই। ঐ মেকানিক দেখাশোনা করতো।

বাড়িতে মিতাশার ভয় করতে শুরু করে। গভীর রাতে অরিত্র ফিরে আসে। চুপচাপ মদ খায়। কে বলবে, আজকেই একসঙ্গে বাবা-মা দুজনকে হারিয়েছে। সোফাতেই বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে।

যোহান সালামকে ডাকে। —কী ভেবেছিস? টাকার জন্য রাস্তার কুকুর হয়ে গেলি? কে অরিত্র মিত্র? ওর শালা বাচ্চা নেই, বউ বেহাত হচ্ছে। তুই সাপোর্ট দিচ্ছিস কেন? শালা, অরিত্রটা এল.আই.সি. আর এফ.ডি.-এর টাকা সব পাবে। তোর কী বে? পেমেন্ট পেয়েছিস? পাসনি। এখন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে কী হবে? কদিন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যা। পুলিশ কিন্তু ফেউয়ের মতো পেছনে। শালা কাজ নেই! জেঠুকে কপচাচ্ছে, দাদুকে ল্যাং মারছে, কাকুকে মাথা ফুঁড়ছে। ক টাকা পাবি রে? সব রোকড়া পাবি না। যা ভাগ্।

সালাম ফেরার পথে টাকার হিসাব মেলাতে পারে না। কয়েকজন সাগরেদ নিয়ে কাছের কৃষ্ণপুর গ্রামে গা ঢাকা দেয়।

মিতাশাকে একদিন অরিত্র বলে—কী বাড়িতে বসে আছো? একটু বেরোও। শপিং টপিং করো। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করো। একটু আউটিং-এ যাও। পাশেই কৃষ্ণপুর গ্রামে দারুণ একটা পার্ক করেছে, দেখে এসো।

—তুমি যাবে? আমাকে নিয়ে।

—আমার সময় হবে না। মা নেই। সব ডিউ পেমেন্ট মেটানো, ম্যানেজারী সামলানো। ওকে। বাই....

মিতাশা ভাবে—কী ব্যাপার? আজ অ্যাত সদয়। প্রচুর মালকড়ি পাবে একটা বাচ্চা যদি দিতে পারতো।

বেশ কয়েকদিন পর, মিতাশা হঠাৎই দুপুরে বেরোয়। ট্যাক্সীতে সৌরকের অফিসের কাছাকাছি আসে। ট্যাক্সী ছেড়ে দেয়। অফিসের বাইরে দুজন অচেনা লোক শুধু শুধু দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। হেঁটেই চলে যায় সামনের বুথে। ওখান থেকে ফোনে সৌরককে ডেকে নেয়। ফোন পেয়ে সৌরক চমকে ওঠে। মিতাশাকে অপেক্ষা করতে বলে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা পুরোনো অল্টো গাড়িতে সৌরক মিতাশাকে ডেকে নেয়।

—কী ব্যাপার? অরিত্র ছেড়েছে? তুমি সুস্থ আছো—এই অনেক।

—কী যে সব হলো......বলা হলো না; হাতের চাপ দিয়ে সৌরক মিতাশাকে থামিয়ে দেয়। ইশারায় ড্রাইভারকে দেখায়।

—আজ, একটা পার্ক-এ আমরা যাবো।

বেশ একটা লঙ ড্রাইভের পর ওরা কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েত-এর পার্কে পৌঁছায়।

—তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমরা আসছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে।

সৌরক আর মিতাশা পার্কে গিয়ে বসে। কী ব্যাপার বল তো? অন্য গাড়ি, অন্য ড্রাইভার।

—যে কোনো একজন আমাকে ও আমার ব্যবসা শেষ করার ষড়যন্ত্র করেছে।

—তোমার শত্রু তো অরিত্র আর সালাম। বহুদিন থেকে টার্গেট তুমি।

—কিসের জন্য?

—অরিত্র সব জেনে গেছে। তোমায় বলেছি তো। ও নিজের নপুংসকতা সহ্য করতে পারছে না।

—তাহলে বাবা-মা-ড্রাইভার-মেকানিক?

—যে বাবা-মা মারা গেলে রাতভোর মদ খেয়ে স্ফূর্তি করে......

—মানে?

—মানে অনেক গভীরে।

—তুমি অ্যাত কিছু জানলে কী করে?

—আমি ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর মেয়ে। ওর চিপ নিয়ে বাটপারি করেছি।

কথায় কথায় আলো কমে আসে। পার্কে কজন স্থানীয় মজুর ওদের লক্ষ্য রাখে। সৌরক কিছু একটা সন্দেহ করে। গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে আর মিতাশাকে বলে কোনো বিপদ হলে মাথা নিচু রাখবে। পারলে গাড়ি ছেড়ে পালাবে।

গাড়ি স্টার্ট দেয়। সূর্য পশ্চিমদিকে হলুদ-কমলা আলো ছড়িয়ে বিশ্রামে যাচ্ছে। হাওয়ায় নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ। রাস্তার ধারে অর্জুন, আকাশমনি, ইউক্যালিপ্‌টাস। রাস্তা ভালো নয়। মাঝারি স্পীডে গাড়ি যাচ্ছে। সামনে আধো আলোয় ভ্যানে চেপে কয়েকজন মজুর, মাথায় গামছা বাঁধা। সামনে চটের থলে। একটা বোম পড়ার শব্দ। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দেয়। চটের থলে সরিয়ে মজুরগুলো র‍্যাট-ট্যাট, র‍্যাট-ট্যাট-দ্রুম শব্দে গুলি ছোঁড়ে। মাথা নীচু করে তিনজনেই পাশের ঝোপে গা ঢাকা দেয়। মজুরগুলো ছুটে আসে। সৌরক ড্রাইভারকে বলে—গাড়িতে যাও। আমরা একটু কানামাছি খেলে আসছি। মিতাশাকে বলে ঘোর-চক্কর খাইয়ে গাড়িতে উঠে যাবে। সামনে খড়ের গাদা। আলো কমে আসছে। মিতাশা একদিকে, সৌরক একদিকে। ওরা চারজন রিভলবার নিয়ে এগিয়ে আসে। দুজন করে দুদিকে ভাগ হয়ে যায়। মিতাশার দিকে যে দুজন যায়, পেছন থেকে সৌরক একটা বাঁশের সজোরে ঘা মারে। রিভলবার ছিটকে যায়। কাদায় হড়কালেই কুচো খড় ছিটিয়ে পালিয়ে যায়। মিতাশা ছুটে গাছের আড়াল থেকে রাস্তায় চলে যায়। কিন্তু শব্দে সচকিত হয়ে বাকি দু'জন সৌরককে দেখে ফেলে। রিভলবার উঁচিয়ে ছুটবে ধাঁ করে। দুটো আধলা এসে লাগে। ড্রাইভার আর মিতাশা ইশারায় গাড়ির দিকে আসতে বলে। একজন রিভলবার পেয়ে ফায়ার করে। সৌরকের পায়ে লাগে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা। রক্ত পড়ছে। পেছনে মৃত্যু। দেহ এলিয়ে যাচ্ছে। কোনোরকমে গাড়িতে ওঠে। ড্রাইভার ধাঁ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। সৌরক রুমাল দিয়ে পায়ের ক্ষতটা বাঁধে। 'লাইফ কেয়ার' নার্সিং হোমে যেতে বলে। মোবাইলে তাহিরকে কোড ল্যাংগুয়েজে গাড়ি কভার করতে বলে।

নার্সিংহোমে সোজা ও.টি.-তে। আধঘণ্টা লাগে তাহিরের আসতে। বাউন্সার দিয়ে মিতাশাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। টোটাল অ্যানেসথেসিয়ায় অপারেশন শুরু হয়। প্রায় দু ঘণ্টা লাগে। সৌরককে অন্য নামে অ্যাডমিট করানো হয়েছে। অর্ঘ্য আর মৃদুল এসে পড়ে, তাহির বুঝিয়ে বলে—টেনশান করার কিছু নেই। প্রেসকে সামলাও। ডেস্কে বলে দাও,—কোন বাবাল্ যেন না হয়।

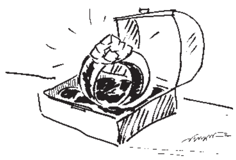

মিতাশার চিন্তায় ঘুম আসে না। বিছানায় ছটফট করে। ল্যান্ডলাইনে একটা ফোন আসে। প্যারালাল কানেকশনে মাউথপিস চাপা দিয়ে মিতাশা প্রায় দমবন্ধ করে শোনে। আলো নিভিয়ে দেয়। অরিত্র নিচে আকণ্ঠ মদ খেয়ে চুর,—শালা, আজকেও মিস্। দুটোই ছিল। ওড়াতে পারলি না। কী টাকা শেষ? আমি কী করবো। কত? মামাবাড়ির আবদার, আর কী? কাজ ফিনিশ কর, পাবি। কী? ট্রেস নেই। যেখানে পারিস খোঁজ। ছিল তো গাড়িতেই। সে গাড়ি হায়ার সেন্টার-এর। কী? পারবো না দিতে। পাঁচ হাজার। পাঁচ পয়সা পাবি না। কী? আমি পেয়েছি কোথায় রে? সবে কাগজপত্র জমা পড়েছে। চুপ, শালা। দাদাগিরি করো না। পেছনে ফেউয়ের মতো পুলিশ ঘুরছে। কাল দুপুরের মধ্যে, ব্যস আর কোন কথা নেই।

কড়াস্ করে রিসিভার নামিয়ে রাখে।

মিতাশা ভয়ে কাঠ। নিচে মাতাল স্বামী। খুনের প্ল্যান কষছে। ছোট জানলাটা খুলে দেখে নেয়। পালানো যাবে না। মরতেই হবে। আজ যদি বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। দরজা ঠিক বন্ধ আছে তো? ছোট আলমারিটা টেনে আনবো কী? না, না। শব্দ হবে। যদি মারে। তাহলে মরতেই হবে। খুব কী লাগবে? সৌরক এখন কী করছে? বেচারি শুধু আমার জন্য জড়িয়ে পড়লো। শ্বশুর-শাশুড়ি এখন স্বর্গে কী করছে? মনে হয় পামেলা আর রাশির সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। শুধু সৌরকের কোম্পানিতে জড়িয়ে হিংসায় মরে গেল—এইসব ভাবতে ভাবতে মিতাশা ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরে তাহির অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসে, মুখে মাস্ক পরিয়ে, মাথায় ক্যাপ দিয়ে সৌরককে স্ট্রেচারে করে গ্যারেজ করে দেয়। রাতেই সব বিল মিটিয়ে দিয়েছিল। ডেস্কে সম্পূর্ণ এন্ট্রিটা ভেরিফ্যাই ও সাইন করিয়ে নেয়।

যোহান পানের দোকানে আসে। রেডিও-তে এফ. এম. চলছে। পানওলা ইশারা করে। যোহান চুল আঁচড়ায় টাঙানো আয়নায়। আয়নার পেছনটা সরে যায়।

—বস, সালাম আর দোস্তরা প্রিন্ট হয়ে গেছে। যে কোনো সময়ে খামে পুরতে পারে, খামে কিন্তু অ্যাড্রেস চাইবে। ল্যামিনেট করে দেবো।

—ফ্রেম ছাড়া করবি আর ঐ শালা....

—ও বলতে হবে না....

যোহান পান মুখে পুরে ভিড়ে মিলিয়ে যায়।

গাড়ি রেখে অরিত্র বিকালে অফিস থেকে বেরোয়। টাকার যোগাড় হয়নি। পুলিশ এসে বার কয়েক জেরা করে গেছে। সালাম সম্পর্কে খোঁজখবর করে। —এটাই কী চক্রব্যূহ? কিছুতেই গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পারি না কেন? টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় লোকজন কম। একটা কিছু করে টাকা আজকে পেতেই হবে। মা-বাবার ঘরে কিছু মাল থাকবে। —এসব নানান কথা ভাবতে ভাবতে আনমনে রাস্তা পেরোতে যায় অরিত্র। নিমেষের মধ্যে চিৎকার-হট্টগোল। একটা গাড়ি অরিত্রকে পিষে দিয়ে সামনের ট্রাফিক স্ট্যান্ডে সজোরে ধাক্কা মারে। পুলিশ ছুটে যায়। ড্রাইভার ছিটকে নেমে পুলিশের কাছে গিয়ে ভয়ে কেঁদে ফেলে। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সীতে অরিত্রকে নিয়ে হাসপাতালে আর ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ।

সালামের অনেক দিনের ইচ্ছা ভালো পেমেন্ট পেলে একটা ফ্ল্যাট কিনবে,—শহর থেকে দূরে। বিকালে তাই প্রোমোটার ইন্দার সিং-এর সঙ্গে মোবাইলে কথা হয়। সালামকে সাইটে ডাকে। লাবণ্যপুরের শান্ত পরিবেশে, চওড়া রাস্তার ধারে, সবুজের মাঝে তৈরি হওয়া ফ্ল্যাটগুলো দেখেই পছন্দ হয়। লেবার, মিস্ত্রীরা সব সাইট থেকে চলে যাচ্ছে। সালাম কয়েকজনকে ইন্দার কোথায়? —জিজ্ঞাসা করে। সবাই ইঁট-কাঠ-কংক্রিটের উঁচু পাঁচতলা বিল্ডিং-এর উপরদিক দেখায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সালাম সজোরে দৌড়ে রেলিং ছাড়া অসম্পূর্ণ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। বুকটা হাপড়ের মত ওঠানামা করে। দম বন্ধ হওয়ার যোগাড়। এদিক ওদিক খোঁজে। সবই ফাঁকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইঁট বালি পড়ে। ধারে কোনো ঘেরাটোপ নেই। নীচের দিকে সালাম একবার মুখ বাড়িয়ে দেখতে যায়। একটা আঁক-আঁ-ঝুপ করে শব্দ। কী যেন পড়ে। নীচে বড় ড্রামে ঢালাইয়ের বাড়তি অংশ পড়েছিল, নরম বালি-সিমেন্ট-পাথরের মিশ্রণ।

পরদিন সকালে লাবণ্যপুর সাইটে ভিড়ে ভিড়ে ভর্তি। শুধু মাথা। আর চলছে গুঞ্জন। সেই ড্রামে একটা হাত বেরিয়ে আছে। হাতে সালামের বিখ্যাত নেপালের আংটি। পুলিশের তত্ত্বাবধানে গাঁইতি দিয়ে জমে যাওয়া কংক্রিট কাটা হয়। একটা করে গাঁইতির ঘা পড়ে, সালামের বউ আছড়ে আছড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কান্নায়। অবশেষে বিকৃত লাশ বের করা হয়। ওয়ারলেশে আরও খবর কৃষ্ণপুরে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে সালামের চারজন সঙ্গীও শেষ।

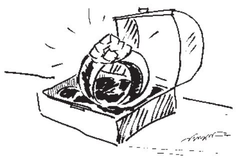

সকালে পুলিশী ঝামেলা-মর্গ-পোস্টমর্টেম-রিপোর্ট-সব ব্যবস্থা করে ফেলে সৌরক। বেলা এগারোটা নাগাদ বডি বাড়িতে আসে। সবটা ঢাকা থাকে,—বিকৃত লাশের। মিতাশা একবার দেখে, ভেতরে চলে যায়। সৎকার মিটিয়ে সৌরক আবার আসে বিকালে। একটা সৌজন্যমূলক দেখা করতে, মিতাশার সঙ্গে। ব্রহ্মময়ী সেবা সমিতিতে শ্রাদ্ধ কাজ মিটে যায়। সৌরক একজন পরিচিত আয়াকে মিতাশার জন্য রাখে। মিতাশা চায়, আর টাকা, পয়সা, হিংসা, ফ্যামিলি, ব্যবসা, রেষারেষি নয়। একটা আনন্দময় বন্ধুত্ব আর সুন্দর প্রাণোচ্ছ্বল জীবনের দোলাচলে যেন কেটে যায় বাকি সময়।

সৌরক বলে—তাহলে আগামী ২৯শে এপ্রিল, তোমার এই বাড়িতে একটা ছোট অনুষ্ঠান হোক। যারা আমাদের পাশে ছিল—আছে ও থাকবে; তাদেরকে নিয়ে, একটু আপ্যায়ন।

সেদিন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সামনে একটু শামিয়ানায় ঘেরা। সকলের গুঞ্জনের মাঝে সৌরক আর মৌমিতা আসে। সৌরক ঘোষণা করে আজ ১৬ই বৈশাখ। আমরা এক বিশেষ কারণের জন্য কাছাকাছি আসতে পারিনি। সকলকে অবাক করে একটা সুদৃশ্য বাক্স থেকে একটা হীরের আংটি নিয়ে পরিয়ে দেয়। আজ আমি মিতাশাকে মর্যাদা দিলাম। যথোচিত কিনা জানি না। মন চেয়েছিল। —'আমরা সবাই পার্টি চাই। পার্টি, পার্টি, পার্টি।' হুল্লোড় আর মজায় মিতাশার চোখ চিক চিক করে ওঠে। দু ফোঁটা জলে ঝাপসা হয়ে যায় চারদিক। সৌরকের বুকে নিশ্চিন্তে মাথাটা রাখে।

—হাতে ঝক্ ঝক্ করে হীরের আংটি।।

আর্তদিন

সুনীল আচার্য

হারুকে নিয়ে নানান রকম উল্টোপাল্টা কথা চালু আছে। যার মুখে যা আসে তাই বলে। তিল হলে তাল বানায়। বানিয়ে বানিয়ে কেচ্ছা ছাড়ে। মূলহীন আলোকলতার মতো সেই কেচ্ছা আবার বেহিসাবি ডালপালা ছড়ায়। হারু সবই টের পায়। কিন্তু প্রতিবাদ করে না কখনো। ভেতরে-ভেতরে তার বেশ সর্বংসহা গুণ আছে। ওই গুণ দিয়েই মানিয়ে নেয় অনেক কিছু। প্রথম দিকে মোল্লাপাড়ার উটকো ছেলেছোকরার দল তার পিছে লেগেছিল ডেঁয়োপিঁপড়ের মতো—লোকটা কে, হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো, পারুর সঙ্গে সম্পর্ক কীসের—এইসব নানান প্রশ্নে খুচিয়ে তাকে জেরবার করে। এমনকী একদিন এরকম তথ্যও শোনা গেল, এ হারু বোধহয় হিন্দুও নয়। হিন্দুয়ানি ভাব ধরে পারুকে পটিয়েছে। কে নাকি সন্ধের পর তাকে স্টেশন সংলগ্ন মসজিদ থেকে বেরুতেও দেখেছে। কে দেখেছে, সেই প্রত্যক্ষদর্শীকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না; অথচ বানোয়াট কেচ্ছা ঠিকই হাওয়ায় ভাসে লাফিয়ে লাফিয়ে। সেসব তথ্য এসে হারুর কানেও ধাক্কা মারে। তবু সে নির্বিকার। চুপচাপ। এসব শুনে সে মনে মনে খুনখুনিয়ে হাসে—যাব না কেন, মসজিদ হচ্ছে খোদার ঘর; খোদার ঘর মানেই সবার ঘর। সেই ঘরে হারু উঠলেই দোষ! ধান্দাপাতি ওই পবিত্র ঘরেও কম কিছু হয় না। তাই বলে সেইসব কদর্য কথাবার্তা কি বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে রটিয়ে বেড়াতে হবে? হারুর রুচিতে বাধে। তাই সে গায়ে মাখে না, চুপচাপ থাকে। মুখে তার কুলুপ আঁটা, যেন দম নিতেও মুখ খুলবে না। দীর্ঘক্ষণ হাসির জন্যে। এই হাসিটুকুই যে কেন সে হাসে, তা আবার বুঝে ওঠার উপায় নেই। শত প্রশ্নে রা কাড়ে না, এদিক-ওদিক তাকায়, ঘাড় চুলকায়, পাঞ্জাবির কোণা ঝাড়ে, চশমার কাচ মোছে, তারপর ওই সামান্য হাসিটুকু মেলে ধরে। ফুলের পরাগ ফোটার মতো কাঁচাপাকা গোঁফের ফাঁকে অসামান্য বিভায় ছড়িয়ে পড়ে তার হাসি। তুলনাহীন বিনয় এবং এক ধরনের বিজয়ের আত্মপ্রসাদে মাখামাখি হয়ে থাকে সেই হাসি।

মুখে তালা এঁটেছে পারুও। কে জানে তার উপরে কেউ কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কিনা। কথার খই ফোটানো মুখ তার; অথচ এই আধবুড়ো লোকটা এসে জুটবার পর থেকে সে একেবারে বদলে গেল। সেই চঞ্চলতা নেই, খিলখিলানো হাসি নেই, পাড়া-বেড়ানো নেই; এমন কি রেলগাড়ি চলে নবাবগঞ্জ-পার্বতীপুর আপডাউনও বন্ধ করে দিল। রেললাইনে মাথা দিয়ে আসল হারু মারা যাবার পর এরকম দম বন্ধ করে ঘরের মধ্যে কাটিয়েছিল বেশ কিছুদিন। তা স্বামী কি কারও থাকে চিরকাল। পারুর বয়সও এমন বেশি কিছু নয়। যার দোষেই হোক, তিরিশ বছরের জীবনে ছেলেপুলেও হয় নি। সামনের বিস্তীর্ণ দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে সে এক সময় ঢোক গিলে দীর্ঘশ্বাস হজম করে নেয়, গা ঝাড়া দিয়ে বাইরে বেরোয় এবং তখনই স্টেশন বাজারের হাফেজ আলি রেলগাড়িতে তুলে দেয়। পুনর্বার বিয়ে করে সংসারি হবার বিকল্প প্রস্তাবও ছিল তার সামনে। পারু স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী জীবনযাত্রার পথটাই বেছে নেয়।

রেলগাড়িতে উঠে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রথম ট্রিপের ব্ল্যাকের মাল টানতে গিয়েই টের পায়, স্বাধীন সে মোটেই নয়। পুরো রেলগাড়ির কামরায় কামরায় তার মতো আরও অনেক নারী-পুরুষের হাত-পা অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা আছে ব্ল্যাকের বস্তার সঙ্গে। ঈশ্বরদীতে নামো কিংবা পার্বতীপুরে পর্যন্তই যাও, সেই সুতোয় বেঁধে দূরে বসেও কলকাঠি নাড়াবে হাফেজ আলি। লাভ লোকসানের হিসাবও তার হাতে; কিন্তু থানা পুলিশ মামলা-মোকদ্দমা জেল-হাজতের রিস্ক ফিফটি-ফিফটি। গায়ে হাত দিয়ে রঙ তামাশার সুযোগ দিলে রিস্ক সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হাফেজ আলির। এভাবে যে যতটা এগোতে পারে, তার রিস্ক ততটা কমে যায়। এই গোলকধাঁধার চক্রে পড়ে পারু প্রথম দিকে চোখে আঁধার দেখে। কিন্তু সহসা সে টের পায়, সুতো যতই অদৃশ্য হোক, বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসা মোটেই সোজা নয়। এরপর সে গা বাড়িয়ে পুরো ব্যাপারটাই সহজ করে নেয়। আবারও কখনও খলবলিয়ে হেসে ওঠে, ঠাট্টা কিংবা ইঙ্গিতময় রগড়ের জবাব দেয় বুদ্ধি খাটিয়ে। এভাবেই চলছিল বেশ।

কিন্তু বছর না ঘুরতেই কোত্থেকে যে এই আধবুড়ো সঙ ধরে নিয়ে এলো এবং কীভাবে যে হাফেজ আলিকে ম্যানেজ করলো সেই জানে, এরপর পারু আবার বদলে গেল। বদলে গেল মানে হঠাৎ যেন পটের বিবি হয়ে গেল। দিনরাত ঘরের মধ্যেই কাটায়। বাইরে বেরোয় না। মুখও খোলে না। কেউ তার ভাবসাব বুঝে উঠতে পারে না। প্রায় প্রতিদিন ট্রেন ধরার জন্যে বাইরে আসে নকল হারু। সবাই বিশেষ নজরে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—মানুষে মানুষে এতটা সাদৃশ্যও হয় কখনো! আসল হারুর মতোই জুলপি বড়, নাক খাড়া, কপালের সামনে চুল পাতলা, গাত্রবর্ণ তামাটে, তফাত শুধু চশমায়। আসল হারু বেঁচে থাকলে বছর দশেকের মধ্যে তার চেহারাও হুবহু এই রকমই দাঁড়াতো, ততদিনে হয়তো সেও নাকের ডগায় চশমা চড়াতো। দুজনের চেহারায় মিল এতটাই। রেলগাড়িতে ব্ল্যাকের মাল টানতে টানতে পারু আবিষ্কার করেছে ডুপ্লিকেট বটে একখানা। অসাবধানে চাবি হারালে মূল্যবান তালার জন্যে মানুষ আবার ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে নেয়, ঘষে-মেজে সেটা উজ্জ্বলও করে হয়তো, তাই বলে হুবহু আগের মতো হয় নাকি?

কিন্তু দোষ বলতে ওই যে মুখে কুলুপ আঁটা, ওইটুকুই। সোজা কথায় কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না কিছুতেই। নিজের নামটুকু বলতেও তার শতসহস্র দ্বিধা। তবু কী অবলীলায় ফুল ফোটার মতো প্রসন্ন মুখ জুড়ে হাসি ফুটিয়ে সব কিছু সামলে নেয়। অবশেষে হাফেজ আলি কথার প্যাঁচে ফেলে একদিন পারুকে রা কাড়ায়। সে কেবল অতি সংক্ষেপে জানায়—ও আমার স্বামী।

স্বামী? শুনে সবাই চমকে ওঠে, তাহলে পারু আবার বিয়ে করেছে। এতোদিনে তলে তলে ঘোলাজলে এই কাজ! কার মনের ভেতরে কী যে থাকে, কে জানে! পারুর চরিত্রের রহস্য এবং তার প্রথম স্বামীর মৃত্যুরহস্য নিয়ে যার মুখে যা আসে তাই মন্তব্য করে। দু-চারজন বুকের মধ্যে গোপন কষ্ট নিয়ে এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানে। কেউ কেউ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে—এ বিয়ে কোথায় হয়েছে, কীভাবে হয়েছে তদন্ত করে জানার উৎসাহ ব্যক্ত করে। দিনে দিনে এক সময় পারুর বিবাহের রহস্য

থিতিয়ে আসে, নকল হারুকে তার স্বামী বলে সবাই মেনে নেয়, নকল হারুর চেহারার আড়ালে কখন আলগোছে আসল হারু হারিয়ে যায়; এমনকী এই লোকটির সত্যিকারের নামটাও আর জানা হয় না। তাই বলে এই হারুকে নিয়ে যে মানুষের কৌতূহল ফুরিয়ে যায় এমন নয়। আউশ ধানের পোয়ালে আগুন ছোঁয়ালে যেমন তা আগ্রাসী লেলিহান শিখায় দাপিয়ে না উঠে ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলতেই থাকে, নকল হারুর ব্যাপারে কৌতূহল অনেকটা সেই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। আক্রমণাত্মক প্রশ্ন নয়, তবু জানতে ঠিকই সাধ হয়—লোকটি রোজ কোথায় যায়, কী করে এবং সর্বোপরি এই লোকটি আসলে কে? কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর কোথায়, কে জানাবে?

নকল হারুর আয় উপার্জনের উৎস কী, সেটাও কেউ উদ্ধার করতে পারে না। অতি উৎসাহী দু-চারজন যুবক তার পেছনে ফেউ হয়ে লেগেছিল, তার সঙ্গে রেলগাড়িতে চেপে পার্বতীপুর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাতায়াতও করেছে, লোকটি কোথায় কী করে তা দেখার জন্যে তক্কে তক্কে থেকেছে, কিন্তু লাভ হয়নি মোটেই। জানা যায়নি কিছুই। পাশাপাশি দু-একটা বগিতে উঁকিঝুঁকি দেয়ার পর সে রেলগাড়িতে উঠে সোজা চলে আসে দরজার কাছে, সেখানেই টয়লেট সংলগ্ন সিঙ্গেল সিটটি তার অতি প্রিয়, আরও ভালো সিট খালি থাকলেও সব সিট পেরিয়ে ওই নির্দিষ্ট সিটে এসে পা তুলে হাঁটুমুড়ে বসে থাকে নির্বিকার। কারও সঙ্গে কথা নেই। চুপচাপ। মাঝে মধ্যে কাঁধের ঝোলা ফাঁক করে কী যেন দেখে নেয়। তারপর পকেট থেকে গুলের কৌটা বের করে আঙুলের ডগায় এক চিমটি গুল নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে চালান করে দেয়। সীমাহীন ঔদাসীন্যে তার চোখমুখ ভাসা-ভাসা। ওই সিঙ্গেল সিটে ঝিম ধরে বসে থেকে সারাদিন কাটিয়ে বিকেলের আপট্রেন ধরে আবার ফিরে আসে। এর মধ্যে কখন কীভাবে অর্থাগম ঘটে, কেউ নির্ণয় করতে পারে না। সরাসরি জিজ্ঞেস করলে প্রথমে তার চেহারায় ঋষিতুল্য গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে আকাশের দিকে তাকায়, তারপর এক গাল বিনয় মেশানো হাসি ছড়িয়ে জানায়—সবই তার ইচ্ছা। এরকম অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট জবাবে তুষ্ট হতে না পেরে কেউ কেউ রটিয়ে দেয়—নকল হারু আসলে সিআইএ-র এজেন্ট। ঘাপটি মেরে থাকে। তার টাকাপয়সা আসে বাইরে থেকে, চোখের আড়ালে।

বাংলাদেশের মতো ছোট্ট দেশটিতে সি-আই-এ'র, এমনকী পাকিস্তানের আইএসআই পর্যন্ত কীভাবে জাল বিস্তার করে রেখেছে তার নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়। নকল হারু যে এই আপাত দৃশ্যমানতার আড়ালের বিশাল গোয়েন্দাবাহিনীরই একজন নয়, একথা কে বলবে জোর দিয়ে! তাছাড়া নকল হারুর উচ্চারণ ভঙ্গিতে এতদঞ্চলের কথারীতি প্রতিফলিত হয় না বলে কেউ কেউ তাকে বর্ণচোরা বিহারি বলেও সাব্যস্ত করে।

কিন্তু বিহারি মুসলমান কেন হিন্দু বিধবাকে বিয়ে করতে যাবে? কী আছে পারুর? জাতধর্ম নির্বিশেষে এ সমাজে কতো রকম বিয়েই তো হতে পারে, হচ্ছেও হরহামেশা; তবু নকল হারুর বিবাহরহস্য নিয়ে জট খুলতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে—পারুর কপালে সিঁদুর নেই। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই শাঁখা-সিঁদুর নেই। সেটাই স্বাভাবিক! কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের পর ওগুলো আবার পরতে বাধা কোথায়! সবাই মিলে পারুকে চেপে ধরলে সে জানায়—ওসব আর ভাল্লাগে না।

ভাল্লাগে না? ভাল্লাগে না মানে কী? তবে কি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মাচারে অরুচি ধরে গেছে পারুর? নাকি পুনর্বার বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে সে ধর্মান্তরিত হয়েছে? এসব সংবেদনশীল প্রশ্নের প্রকৃতপক্ষে কোনো সুরাহা খুঁজে পাওয়া যায় না।

চারদিকে এতো সব কৌতূহল, সংশয়, প্রশ্ন সজারু-সজাগ কাঁটা মেলে রাখে তবু নকল হারুকে যেন কিছুতেই স্পর্শ করে না। তার সেই নিত্যদিনের রুটিন—সকালে স্টেশনের টি-স্টল থেকে এক কাপ চা খেয়ে রেলগাড়িতে ওঠে, আবার দিন শেষে ঠিকই ফিরে আসে পারুর আঁচলের তলে। আধবুড়ো ভাম এ লোকটিকে যে কী জাদুতেই বেঁধেছে, সে কেবল পারুই জানে। সন্ধেবেলার ট্রেন থেকে নেমেই হনহন করে পা চালিয়ে দেয় রাস্তায়। হঠাৎ সেদিন হাফেজ আলির চোখে পড়ে তাকে,

—এক কাপ চা খেয়ে যাও হারুদা।

আড়ালে আবডালে নয়, পারুর স্বামীকে এখন প্রকাশ্যেই অনেকে হারু বলে ডাকে, এতে তার কোনো আপত্তিও কখনো শোনা যায় নি। বরং নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে যেন সম্মতিই জানিয়েছে সবাইকে। হাফেজ আলির দিকে চোখ তুলে প্রথমে এক গাল হাসি ছড়িয়ে দেয়, তারপর বিনম্র আপত্তি জানায়—আজ থাক মিয়াভাই, অন্যদিন খাব।

কিন্তু হারুর আপত্তিকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে হাফেজ আলি তাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনে এক চায়ের দোকানে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন মারমুখো যুবক গোল হয়ে ঘিরে ধরে। চায়ের অর্ডার দেওয়ার পরিবর্তে হারুর মুখোমুখি বসে হাফেজ আলি—একরাশ অভিযোগ উত্থাপন ক'রে। তাদের ধারণা—গত নির্বাচনের আগে ও পরে হিন্দুপাড়ায় যে সামান্য গোলমাল হয়েছে, হারু তাকেই রঙ মাখিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কেচ্ছা তৈরি করে জেলা শহরের সাংবাদিকদের কাছে ঝেড়ে এসেছে। সে নিশ্চয় ইন্ডিয়ান স্পাই। এইবার তার স্পাইগিরি ছুটিয়ে দেবে।

হারু এমনিতেই কথা বলে কম, হাসে বেশি; অভিযোগের ধারা শুনে সে এতোটাই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে যে হাসি দূরে থাক, প্রতিবাদ করার শক্তিটুকুও একেবারে উবে যায়। নির্বাচন আসার মুহূর্তেই অস্বস্তি হয়েছে তার। এর আগেও সে হাফেজ আলিকে দু'বার জানিয়েছে, এখানকার ভোটারলিস্টে তার নাম নেই। কাজেই ভোট-টোট নিয়ে তার মাথাব্যথাও নেই। পারুর যাকে খুশি তাকে ভোট দেবে।

'যাকে খুশি তাকে?' হাফেজ আলির ধমকানির মুখে আশ্বস্ত করেছিল, সে যাকে বলবে তাকেই ভোট দেব পারু; হাজার হলেও পারুর দুঃসময়ে সে যে পাশে দাঁড়িয়েছিল এ কথা ভুলবে কী করে! তাছাড়া ব্র্যাকের ব্যবসার কারণে নামের শেষে আলি যুক্ত হলেও হাফেজ মিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক দাপটের খবর কারও অজানা নয়। বড় এক দলের এমপি প্রার্থীর সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব, তার কথায় বাইরে যাবে কে! কিন্তু শেষপর্যন্ত পারু কোথায় ভোট দিয়েছে সত্যি সত্যি, সে কথা আর জানা হয় নি। ভোটের পর হিন্দু পাড়ায় যে ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা ঘটে গেল সে তো চোখের সামনের ঘটনা। তবু হারু চোখ খোলেনি, মুখও খোলেনি; কিন্তু এখন এই অভিযোগ সে খণ্ডাবে কী করে! বলা নেই কওয়া নেই, হাফেজ আলি সহসা অন্য মানুষ হয়ে যায়; মেঘের রঙ বদলাতে যে সময় লাগে তার চেয়ে দ্রুত নিজেকে বদলে ফেলে এবার চায়ের অর্ডার দেয়, হাত নেড়ে সাঙাতদের সরিয়ে দেয়—এই যা, তোরা এখন যা দেখি! হারুদার সঙ্গে আমার প্রাইভেট আলাপ আছে। পকেট হাতড়ে

সিগারেটের প্যাকেট বের করে সামনে ধরে—নাও, সিগারেট ধরাও, চা আসছে।

হারু সিগারেট খায় না, সে কথা আগেও দু'বার বলেছে। আবার ওই একই কথা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে সে হা করে উপরের দিকে তাকায়। হাফেজ আলি দিলখোলা ঘোষণা দেয়—'চা সিগারেট খাও। এই নাও অল্প কিছু টাকা রাখো, পারুকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখো, ফুর্তি-ফার্তা করো।' এই পর্যন্ত বলার পর পাঁচশ টাকার নোট দুটোর পাশে একটা কাগজ রেখে সে জানায়, 'এইখানে সই করতে হবে। হারু এবং পারু তো সই করবেই, হিন্দুপাড়ার আরও সবার সই করিয়ে দেবে। স্বাক্ষরের সংখ্যা বেশি হলে দাবিটা জোরালো হবে যে নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় এখানে কোনো সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়নি।' কাগজের মাথায় এই সব লেখা পড়ে হারু শিউরে ওঠে—এ কাগজে সে কাকে সই করতে বলবে? হরি কর্মকার এতে সই করবে কেন, তার যে ধরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে! ভরত দাস কেন এতে সই দেবে, তার যে দুই পুত্রবধূ এবং স্কুল পড়ুয়া কন্যা ধর্ষিতা হয়েছে! কমল সাহা সই দেবে কেন এতে, তার যে দোকানপাট সব লোপাট হয়ে গেছে! মিত্তির বাড়ির কে সই করবে এই কাগজে? তাদের বড় মেয়ে সতী বিয়ের পাঁচদিন আগে ধর্ষণের শিকার হয়ে অবশেষে আত্মহত্যা করে প্রাণ জুড়িয়েছে। 'সাংবাদিকদের পাড়ায় ঢুকতে দেব না' বললেও খবর তো চাপা থাকেনি! এখন আবার সেই খবর উল্টোনোর জন্য কাগজে সই করাতে হবে! হারুর মেরুদণ্ড শিরশির করে, দুচোখ বিস্ফারিত হয়। টেবিলের উপরে পাঁচশ টাকার নোট দুটো এবং টাকার অধিক মূল্যবান কাগজটাও পড়ে থাকে, হাঁটুতে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। হাফেজ আলিও তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে,

—কী হলো! কাগজটা নিয়ে যাও!

হারুর ঠোঁট তড়পায়, কিন্তু কোনো শব্দ বেরোয় না। টেবিল থেকে কাগজটা নিয়ে দলিল-দস্তাবেজের মতো যত্ন করে ধীরে ধীরে ভাঁজ করে তারপর পরম সখ্যতায় সেটা হারুর পকেটে চালান করে হাফিজ আলি জানিয়ে দেয়—সই-স্বাক্ষর সেরে রেখো। দু-একদিনের মধ্যে আমাদের লোক গিয়ে কাগজ নিয়ে আসবে।

বাড়ি ফেরার পর এই দু-একদিন আর কাটে না হারুর। রুটিনমাফিক বাইরে বেরোয় না। ঘরের মধ্যে গুম ধরে বসে থাকে। ভাবগতিকের কিছুই বুঝতে পারে না পারু। শতেক প্রশ্ন ক'রে, একটারও জবাব পায় না। তখন সে কী করে। কীইবা করার আছে তার! ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে বসে, মিহি কান্নার সুরে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসার মতো আপনজন তার কেউ নেই। একাই কাঁদে একাই চোখ মোছে; ঘরকন্নার কাজ করে, রান্না হলে অন্যান্য দিনের মতো দুটো থালায় বেড়ে নিয়ে খেতে বসে। দু-চার গ্রাস মুখে তোলার পর টের পায়, স্বামীর পাতের ভাত কেবল পাঁচ আঙুলে নাড়াচাড়াই হচ্ছে, খাওয়া হচ্ছে না। চোখ গোল করে তাকায় পারু, তারপর তার হাতও থেকে পড়ে পাতের উপর।

—খাচ্ছো না যে!

—চেষ্টা করছি তো! খিদে নেই।

—কী হয়েছে আমাকে বলো।

বলবো না বলবো না করেও ফস করে বলে ফেলে,

—চলো, এখান থেকে পালাই।

—কেন? কোথায়?

ডুকরে ওঠে পারু। কিন্তু স্বামীর মুখে আবার তালা আঁটা। কিছুতেই আর মুখ খোলাতে পারে না। তখন ভয়ানক অচেনা এবং রহস্যময় মনে হয় মানুষটিকে। এতোদিন পর একটুখানি অনুশোচনাও হয়—হঠাৎ করে ঝোঁকের মাথায় এ-কার হাতে সে হাত রেখে ভবিষ্যৎ ভাসিয়েছে অনিশ্চিত পথযাত্রায়!

রহস্যের ঘোর ভাঙে সেদিনই রাতের অন্ধকারে। সন্ধের পর পরই হিন্দু পাড়ায় নেমে আসে শ্মশানপুরীর নিস্তব্ধতা। কোথাও জীবনের স্পন্দন নেই বুঝি বা। মোটরবাইকের হেড লাইটের তীব্র আলোয় আঁধার কেটে আসে তিন যুবক। এসেই হারুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুরু করে চোটপাট,

—সই-স্বাক্ষর করানো হয়েছে?

ভয়ে চোখ ফেটে বেরুতে চায়, কিন্তু মুখে কোনো উত্তর নেই।

—কই, সেই কাগজটা কোথায়? ক'জনের সই হয়েছে দেখি!

অবাক বিস্ময়ে পারু এগিয়ে আসে,

—কাগজ! কিসের কাগজ!

'এ্যাঁহ, কিসের কাগজ!' একজন মুখ ভেঙচিয়ে হারুর দিকে মারমুখো হয়ে তেড়ে যায়। তখন সে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজ বের করে। পাণ্ডা মতো একজন ছোঁ মেরে সেই কাগজ কেড়ে নিয়ে ভাঁজ খুলে চেঁচিয়ে ওঠে—'একজনও তো সই করেনি লিডার!' প্রথমজন সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে একটা চড় কষে দেয়—'নিজের সইটাও করেনি শালা বুড়ো ভাম!' চড় খেয়েও হারু চুপ করেই থাকে, কিন্তু আর্তনাদ করে ওঠে পারু—'ওকে তোমরা মারছো কেন! কোথায় সই করতে হবে, আমাকে দাও, আমি করে দিই!' তিনজনের মধ্যে একজনকে পারু খুব চিনতে পারে; স্বামী মারা যাবার পর দিনরাত খুব জ্বালিয়েছে তাকে, সে-ই খ্যাকখ্যাক করে খেঁকিয়ে ওঠে—'দাঁড়া, দাঁড়া, তোর ওপরে নির্যাতনটা আগে হোক, তারপর সই করিস খান্‌কি মাগি!' প্রথমজন ধমকে ওঠে—'নে নে, দুজনেরই সই করিয়ে নে।'

অতি সামান্যই লেখাপড়া জানে পারু। ধীরেসুস্থে চেষ্টা করলে হয়তো ওই ভাঁজ খোলা কাগজের লেখাটুকুর পাঠোদ্ধারও তার পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে সে দ্রুত হাতে ভাঙা ভাঙা অক্ষরে নিজের নাম স্বাক্ষর করে দেয়—'মোছা, পারু খাতুন।'

নামের এই ধরন দেখে আগন্তুকদের চোখ কপালে। প্রথমজন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—'মোছাম্মাৎ, খাতুন!—এসব কী রে! কী লিখেছিস এটা?'

একটুও বিলম্ব না করে পারু ঝটপট জানায়, —'ওটাই আমার নাম। আমার স্বামী মুসলমান। ওকে বিয়ে করে আমিও মুসলমান হয়েছি।'

এই তথ্যে আগন্তুক তিনজনই প্রথমে একটু হকচকিয়ে যায়। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের বিড়ম্বনা মাত্র। মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের কর্তব্য স্থির করে ফেলে। ক্ষিপ্র হাতে তারা নকল হারুর ধর্মচিহ্ন আবিষ্কারে তৎপর হয়ে ওঠে! হ্যাঁচকা টানে তার পরনের লুঙ্গি খুলে ঘরের খুঁটির সঙ্গে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে এবং লুঙ্গি পেঁচিয়ে মুখের গহ্বরে ঢুকিয়ে দেয়। এরপরে তারা তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়ে মোছাম্মাৎ পারু খাতুনের শরীরে।

তখন পারুর পায়ের কাছে লুটোপুটি খায় ভাঁজ খোলা মহামূল্য কাগজটি। দু'পায়ের নিষ্ফল দাপাদাপির কারণে নকল হারুর ধর্মচিহ্নসম্বলিত নিরাবরণ শিশ্নটি অসহায় পেণ্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে একসময় মূত্রধারা ঝরিয়ে দেয় পারুর স্বাক্ষরযুক্ত কাগজটির উপরে!